২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ □ ২২ তম সংখ্যা

৩১ মে, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমাদের সমস্ত উন্নতির ভিত্তি খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের মাঝে নিহিত" বেশি বেশি দোয়া করতে থাকুন আর প্রমাণ করে দিন চিরকালের মত আজও 'কুদরতে সানিয়া' এবং গোটা জামাত এক ও অভিন্ন অস্তিত্ব আর চিরকাল অভিন্নই থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

"খিলাফতের প্রতি আনুগত্যকে স্থায়ী রূপ দিন। আল্লাহ্‌র এ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন"

জামাতের সকল সদস্যের প্রতি
সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর

ভালবাসাপূর্ণ বিশেষ বাণী

প্রাণাধিক প্রিয় জামাতের সদস্যবর্গ!

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর আকস্মিক মৃত্যু এমন একটি প্রলয়তুল দুর্ঘটনা যা জামাতের প্রতিটি সদস্যকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত আর হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত বেদনাহত। কিন্তু আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ইচ্ছায় সন্তুষ্ট হয়ে আর তাঁর তকদীরের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নিচ্ছি। আমাদের সবার আন্তরিক দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদ হলো 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন'। আমরা সবাই খোদাতাআলার আমানত আর তাঁর পক্ষ থেকে আগত এ কঠিন পরীক্ষাকে নতশিরে গ্রহণ করছি।

আমাদের প্রভু-প্রতিপালক অতি স্নেহশীল। তিনি এ যুগে হযরত মসীহ্‌য্ যমান (আঃ)-কে জগতের সংশোধন আর মহানবী (সঃ)-এর শরীয়তকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছিলেন সেই মহান উদ্দেশ্যকে স্থায়ীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে তিনি এমন এক 'কুদরতে সানিয়া'-র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা স্থায়ী হবে বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে; আর তা প্রত্যেক খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার মাধ্যমে মু'মিনদের ভীতিপ্রদ অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবে। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন; "অতএব হে আমার প্রিয় ব্যক্তিবর্গ! আদিকাল থেকে বিরোধীদের দু'টো মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থ করে দেখানোর জন্য নিজের দু'টি কুদরত প্রদর্শন করা যেহেতু আল্লাহ্‌র বিধান তাই আল্লাহ্‌র পক্ষে এবারও তাঁর এ স্থায়ী বিধান লঙ্ঘন করা অসম্ভব। তাই আমার বর্ণনাকৃত কথায় তোমরা দুঃখিত ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ো না। কেননা, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত প্রত্যক্ষ করাও আবশ্যক, এবং এর আগমন তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা, এটা স্থায়ী ব্যবস্থা। এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না" (আল্ ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫, ৩০৬)।

আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হুযূর (রাহেঃ)-এর মৃত্যুতে সৃষ্ট ভীতিপ্রদ অবস্থাকে নিরাপত্তা ও শান্তিতে পরিণত করে নিজে হাতে কুদরতে সানিয়া'র পুনর্বিকাশ ঘটিয়ে তিনি আমাদের প্রতি অশেষ কৃপা আর দয়া প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং দোয়ার মাধ্যমে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ মহান দায়িত্ব এককভাবে এক ব্যক্তির পক্ষে যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। দোয়া করুন এবং বেশি বেশি দোয়া করতে থাকুন আর প্রমাণ করে দিন চিরকালের মত আজও 'কুদরতে সানিয়া' এবং গোটা জামাত এক ও অভিন্ন অস্তিত্ব আর চিরকাল অভিন্নই থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

'কুদরতে সানিয়া' খোদার পক্ষ থেকে একটি বড় পুরস্কার। এর উদ্দেশ্য হলো জাতিকে একত্র করা এবং বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা করা। এ সেই মালা যার মাঝে জামাত মণি-মুক্তার মত গেঁথে রয়েছে। মণি-মানিক্য বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকলে তা নিরাপদ থাকে না, আর দেখতেও সুন্দর লাগে না। মালায় গাঁথা মণি-মুক্তা দেখতেও সুন্দর আর থাকেও নিরাপদ। 'কুদরতে সানিয়া'র বিকাশ না ঘটলে সত্য ধর্ম কখনো উন্নতি করতে পারতো না। অতএব এ কুদরতের সাথে নিষ্ঠা, ভালবাসা ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সম্পর্ক রক্ষা করুন এবং খিলাফতের প্রতি আনুগত্যকে স্থায়ী রূপ দিন। আর এর প্রতি ভালবাসা এতটা বৃদ্ধি করুন যেন এর তুলনায় অন্যান্য সকল সম্পর্ক তুচ্ছ মনে হয়।

(অবশিষ্টাংশ ৩৬ পাতায় দেখুন)

দু'টি কথা

আমাদের প্রিয় নবীর জীবন আমাদের সামনে খোলা পুস্তকের ন্যায়। কুরআন জানতে হলে আমাদেরকে তাঁর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত হতে হবে। আর এজন্যে জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হুযূর (সঃ)-এর জীবনী গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক। প্রত্যেক বাড়িতে এর চর্চা হওয়া আবশ্যক।

হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্যে পরম ও সুন্দরতম আদর্শ। তাই অন্যান্য মাসে তো বটেই বিশেষ করে রবিউল আউয়াল মাসে প্রত্যেক জামাতে বেশি বেশি করে এমনকি হালকায় হালকায় আর সম্ভব হলে প্রত্যেক বাড়ীতে সীরাতুন নবী (সঃ)-এর জলসার আয়োজন করে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা উচিত। এতে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া আবশ্যক। এমনকি নবী করীম (সঃ) সম্বন্ধে তাদের মতামত জানার জন্যে তাদেরকেও আলোচনা করার সুযোগ দেয়া উচিত।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকে যেন নবী করীম (সঃ)-এর বিরাট জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও পড়াশুনা করি ও অন্যদেরকেও পড়াশুনা করতে উৎসাহ দান করি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের জাতীয় মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ শূরায় যারা সদস্য এতে যোগদান করা তাদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক জামাত থেকে এতে যোগদানের চেষ্টা করা প্রয়োজন। যারা বিশেষ কারণে যোগ দিতে পারবেন না তাদের লিখিতভাবে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। যারা এরপরও অনুপস্থিত থাকবেন তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবেন। এ শূরা পার্থিব কোন পার্লামেন্ট বা সমাবেশ নয়। এর নির্ধারিত কতগুলো পবিত্র রীতি-নীতি রয়েছে সেগুলো মেনে চলাও ঈমানী দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে পাক্ষিক আহমদীর কয়েকটি সংখ্যায় মোহতরম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেব, ওকীলে আলা তাহরীকে জাদীদ সংকলিত 'আহমদী জামাতে শূরার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ সংখ্যায়ও কয়েকটি নীতি-নির্ধারনী বিষয় ছাপা হয়েছে। এর মাঝে শূরার রীতি-নীতি ও নিয়ম কানুন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এটা পাঠ করা ও তদনুযায়ী আমল করা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। শূরার কাজ যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্যে সকলের পূর্ণ সহযোগিতা ও দোয়া কাম্য। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ২২তম সংখ্যা

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ২৮ রবিউল আউয়াল ১৪২৪ হিঃ কাঃ
৩১ হিজরত ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩১ মে ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

মজলিসে শূরা

মজলিসে শূরা-পরামর্শ সভা ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম। এটা নবুওয়ত এবং এর অবর্তমানে খিলাফতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্তাআলার নির্দেশ মোতাবেক (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬০ ও সূরাতুশ্ শূরা ঃ ৩৯) মু'মিন সমাজের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মজলিসে শূরাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঠামোগত রূপ দান করেন। শূরার গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- লা খিলাফাতা ইল্লা 'আন্ মাশওয়ারাতিন অর্থাৎ পরামর্শ ব্যতিরেকে খিলাফত হতে পারে না। এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কার্যকরী ছিল। মজলিসে শূরার মাধ্যমে খলীফার প্রতি ন্যস্ত আমানতের দায়িত্ব পালনে মু'মিন সমাজও অংশীদার হয়।

মজলিসে শূরা তথাকথিত কোন আইন সভা বা পার্লামেন্ট নয়। এখানে কোন বিরোধী দল বা ওয়াক আউট নেই। এখানে খলীফা কর্তৃক পরামর্শ চাওয়া হয়। স্বেচ্ছায় পরামর্শ দেয়ার সুযোগ এখানে গৌণ। মু'মিন সমাজ এক দেহ এক মন হয়ে নেযামের আহ্বানে নির্ধারিত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এখানে কূট-সমালোচনা বা বিরোধিতার অবকাশ নেই। ব্যক্তি স্বার্থকে পিছনে ফেলে এখানে সামগ্রিক উন্নতি এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এখানে আছে অতীতের পর্যালোচনা, বর্তমানের জন্যে দোয়া এবং ভবিষ্যতের জন্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তাকওয়া ও খোদা-ভীতিকেই এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়। বড়ই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি খিলাফত ছাড়াও কোন কোন দল বা গোষ্ঠি মজলিসে শূরা করে থাকেন ও এটাকে পার্লামেন্টের স্থলাভিষিক্ত মনে করে থাকেন; অথচ মজলিসে শূরা খিলাফতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আর খিলাফত ব্যতিরেকে কোন মজলিসে শূরা হতেই পারে না।

হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ে আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফযলে উমর মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে রীতিমত মজলিসে শূরার প্রবর্তন করেন। তখন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এ মজলিসে শূরা কার্যকরী রয়েছে যা আহমদীয়তের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে প্রতীয়মান। প্রতিচ্ছায়ারূপে দেশে দেশে জাতীয় পর্যায়েও এ মজলিস দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকরী রয়েছে। প্রয়োজনে জাতীয় আমীরের আহ্বানে এ মজলিস তাঁকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

খলীফায়ে ওয়াক্ত আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কুরআন এবং সুন্নাহ্র উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই সর্বদা শূরার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে তিনি বাধ্য নন, মু'মিন সমাজের কল্যাণের তাগিদে তিনি তা নাকচ করারও ক্ষমতা রাখেন। পরবর্তীকালে খলীফায়ে-ওয়াক্তের এ পদক্ষেপ মু'মিন সমাজের জন্যে সুফলদায়ক বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ইসলাম ও আহমদীয়তের ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

আমরা মজলিসে শূরার সর্বাঙ্গীণ সুফল এবং স্থায়ীত্ব কামনা করি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ্তাআলা গোটা দুনিয়ার মানব সমাজকে মজলিসে শূরার পদ্ধতি উপলব্ধি ও অবলম্বন করার এবং এথেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। বলা বাহুল্য, এতে বর্তমান বিশ্ব একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রের লাগামহীন কুফল থেকে রক্ষা পেতে পারে।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আলে ইমরান - ৩	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ যুগ-ইমাম	ঃ অনুবাদ - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩-৪
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী - হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মৌঃ মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন	৪-৫
মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	৫-৬
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার সিফত 'খবীর'-এর ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৭-১০
জুমুআর খুতবা ঃ মজলিসে শূরার ভিত্তি হলো তাকওয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১১-১৪
ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১৫-১৬
শূরার প্রতিনিধিবৃন্দের জন্যে কতিপয় বিশেষ দিক-নির্দেশনা	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৬-১৭
মুলাকাত ঃ বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৮-২০
স্মৃতিকণা ঃ ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২০
কবিতা- কে বলে তুমি নেই?	ঃ আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২০
সমস্ত বিশ্বের ওপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীনের আশীষ ও কল্যাণ মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী' (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	২১-২২
মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'	ঃ জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২৩-২৪
মোনাজাতে রসূল (সঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৫
ছোটদের পাতা ঃ এস হাদীস শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৬-২৭
সময়ের দাবী ঃ ঐক্যবদ্ধ	ঃ জনাব সরফরাজ এম এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২৭-২৮
সত্য চাপা থাকে না	ঃ জনাব আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া	২৯-৩১
নতুনদের পাতা ঃ ● কবিতা ঃ চির বাসনা	ঃ মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী	৩২
● পর্দা প্রগতির দিশারী	ঃ জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩৩-৩৪
কবিতা - হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর অন্তর্ধানে অশ্রু অঞ্জলি	ঃ জনাব আবুল হাসান	৩৫
সংবাদ	ঃ	৩৫-৩৬

প্রচ্ছদ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা ও বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)

নিজের জামাতের জন্যে দোয়া

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) নিজের পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ'-তে আমাদের শিক্ষা বর্ণনা করে এ দোয়া দ্বারা শেষ করেন ঃ

"এখন আমি দোয়া করছি, আমার এ শিক্ষা তোমাদের জন্যে কল্যাণজনক হোক এবং তোমাদের মাঝে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি হোক যেন তোমরা পৃথিবীর তারকায় পরিণত হয়ে যাও আর পৃথিবী এ আলোকে আলোকিত হোক যা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের লাভ হয়" (কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ৭৬, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫)।

আহমদী জামাতের উন্নতির জন্যে দোয়া

"হে আল্লাহ্! আমার জামাতের উন্নতি হোক। আর তোমার সাহায্য ও সমর্থন এর সাথে থাকুক" (সীরত হযরত মসীহ্ মাওউদ, প্রণেতা হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২৮)।

"আমি তো অনেক দোয়া করে থাকি। আমার জামাতে সেসব লোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক যারা খোদাতাআলাকে ভয় করে এবং নামাযে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। রাতে উঠে মাটিতে পড়ে যায় এবং কান্নাকাটি করে এবং খোদার প্রতি কর্তব্যসমূহ

কালামুল ইমাম

অবহেলা করে না। কৃপণ, অমনোযোগী ও মাটির কীট নয়। আর আমি আশা রাখি যে, খোদাতাআলা আমার দোয়া কবুল করবেন আর আমাকে দেখাবেন যে, আমি আমার পরে এমন লোকদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি যারা এমন নয় যে, চোখ দিয়ে ব্যভিচার করে, তাদের মন পায়খানা থেকেও খারাপ আর তারা মৃত্যুকে স্মরণ করে না। আমি ও আমার খোদা এগুলোর প্রতি বিরাগভাজন। আমি অনেক খুশী হবো যদি এমন লোক এ সংযুক্তি কর্তন করে নেয়। কেননা, খোদা এ জাতিকে এমন একটি জাতিতে রূপান্তরিত করতে চান যার দৃষ্টান্ত দেখলে খোদাকে স্মরণ হয় আর যারা খোদা-ভীরুতা ও পবিত্রতায় উচ্চ মার্গের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির ওপরে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেসব দুষ্ট লোক যারা আমার হাতের নীচে হাত রাখে আর এটা বলে যে, আমরা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছি। আবার তারা তাদের ঘরে গিয়ে এসব দুষ্ট কাজে মশগুল হয়ে যায় তাদের প্রাণে কেবল পার্থিব ধ্যান-ধারণাই থাকে। তাদের দৃষ্টিও পবিত্র নয় আর তাদের অন্তরও পবিত্র নয়। তাদের হাত কোন পুণ্য কর্ম করে না এবং তাদের পা পুণ্য কাজের জন্যে কোন নড়া-চড়াও করে না। তারা এমন ইঁদুরের মত যা সেই অন্ধকারের মাঝে প্রতিপালিত হয় এবং তাতেই বসবাস করে এবং সেখানেই মারা যায়। আকাশে আমাদের জামাতের থেকে তাদের (নাম) কেটে দেয়া হয়। তারা অযথা বলে যে, আমরা এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আকাশে তাদেরকে জামাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না" (তবলীগে রেসালত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১-৬২)।

উপস্থাপন ও অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

লন্ডন জলসায় যোগদানেচ্ছুক ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য

এর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আগামী ২৫-২৭ জুলাই ২০০৩ তারিখে যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

জলসায় যোগদানেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে আগামী ১৫ই জুন, ২০০৩ এর মধ্যে স্ব স্ব জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট এর সুপারিশ ও নিম্নোক্ত কাগজাদি সহ দরখাস্ত ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারীর বরাবরে জমা করতে অনুরোধ করা হয়েছেঃ

(১) পাসপোর্টের ফটোকপি (প্রথম ৫ পৃষ্ঠা)
(২) পাসপোর্ট সাইজের ফটো (২ কপি)
(৩) জামাত ও অঙ্গ সংগঠনের চাঁদার সার্টিফিকেট

- নির্বাহী সম্পাদক

কুরআন মাজীদ

সূরা আলে ইমরান - ৩
শূরা

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। অতএব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমল-চিত্ত হয়েছে,৫১৪ আর যদি তুমি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে দূরে সরে পড়তো। অতএব তুমি তাদেরকে মার্জনা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর,৫১৫ এরপর যখন তুমি (কোন বিষয়ে) দৃঢ়সংকল্প করে ফেল তখন আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন।

শূরা সংক্রান্ত হাদীস

আন উমারা (রাঃ) কূলা লা খিলাফাতা ইল্লা 'আন মাশওয়ারাতিন অর্থাৎ শূরার মাধ্যম ছাড়া কোন খিলাফত নেই (কনযুল উম্মাল, কিতাবুল খিলাফা মাআল আমারা,পৃষ্ঠা ১৩৯)।

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যকর। মহানবী (সঃ) সকল বড় বড় ব্যাপারেই তাঁর অনুসারীদের পরামর্শ নিতেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বেও তিনি পরামর্শ করেছেন, তেমনি করেছেন উহুদ ও আহযাবের যুদ্ধের পূর্বে। এমনকি তাঁর মহিমান্বিতা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল তখনও তিনি যোগ্য ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য উদগ্রীব থাকতেন' (মনসুর, ২য়, ৯০)। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, পরামর্শ ছাড়া খেলাফত নেই (ইযলাতুন খীফা আন খিলাফাতুল খুলাফা)। অতএব পরামর্শ দান ও গ্রহণ বিশেষতঃ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ যা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। খলীফা অথবা মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান অবশ্যই মুসলমান প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শ আহ্বান করবেন যদিও তিনিই শেষ সিদ্ধান্তের মালিক। ইসলামী 'শূরা' বা 'মুশাওয়ারা' (পরামর্শসভা) পশ্চিমা পার্লামেন্টের মত নয়। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনকর্তার এ অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছা করলে পরামর্শ সভার সুপারিশ গ্রহণ না-ও করতে পারেন। তবে তিনি তাঁর এ ইচ্ছা কদাচিৎ বিশেষ বিবেচনার সাথে প্রয়োগ করবেন। সাধারণতঃ গ্রহণের জন্যই পরামর্শ ও সুপারিশগুলো দেয়া হয়।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১। আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে কেউই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর বিপক্ষে৫১৬ আর কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? এবং আল্লাহ্‌রই উপর মু'মিনদের ভরসা রাখা উচিত।

৫১৪। এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর ভদ্র, প্রীতিপূর্ণ ও সদাশয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাঝে রয়েছে সর্বব্যাপী দয়া-দাক্ষিণ্যের অনন্য সাধারণ গুণ, যা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতো। মানব হিতৈষণা ও কৃপা-করুণায় তিনি এতই ভরপুর ছিলেন যে, কেবল নিজের সাথীদের ও অনুসারীদের প্রতিই তিনি দয়া দেখান নি, বরং তাঁর প্রাণঘাতী শত্রুরাও তাঁর দয়া-মায়া ও স্নেহ-প্রীতি থেকে সমভাবে অংশ পেয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, ওহুদের যুদ্ধের সময় যে সকল মুনাফিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়েছিল, তাদেরকেও তিনি শাস্তিদান থেকে বিরত থাকেন। এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন।

৫১৫। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইসলামের একটি বিরল বৈশিষ্ট্য হলো ইসলাম পরামর্শ গ্রহণ বা 'মুশাওয়ারা'কে একটি মৌলিক নীতি হিসাবে অঙ্গীভূত করেছে।

৫১৬। 'মিম্ বা' দিহি'র একটি অর্থ হলো 'তিনি ছাড়া'। এর আক্ষরিক অর্থ 'এর পরে'। অন্য অর্থ, 'এর বিপক্ষে' একে বাদ দিয়ে'।

হাদীস শরীফ

যুগ-ইমাম

কুরআন ঃ

ইন্না আরসালনা ইলায়কুম রসূলান শাহিদান আলায়কুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআওনা রসূলা।

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রসূল প্রেরণ করেছিলাম (সূরা আল্ মুয্যাম্মিল ঃ ১৬)

হাদীস ঃ

ইন্নাল্লাহা ইয়াবআসু লিহাযিহিল উম্মতি 'আলা রা'সি কুল্লি মিআতি সানাতিন মাঁইইউযাদ্দিদু লাহা দীনাহা।

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা এ উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যে তাদের জন্যে তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবে' (অর্থাৎ উম্মতের মাঝে যে বি'দাত সৃষ্টি হবে তা সংশোধন করবে) (আবূ দাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, বাবুল মালাহেম)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ উম্মত বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্‌তাআলা এ উম্মতকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্‌তাআলার সদয় দৃষ্টি এ উম্মতের প্রতি সর্বদা থাকবে। তিনি এ উম্মতকে বিভ্রান্তির মাঝে রাখবেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করবেন এ উম্মতের সংশোধনের জন্যে তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন।

কুরআন ও হাদীসের এত স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ উম্মতের অনেকেরই ধারণা যে, এ উম্মতের দুর্দশা লাঘবের জন্যে কোন ব্যক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অপরদিকে অনেকেই বড় গলায় দাবী করেন, নতুন কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না তবে পুরাতন নবী হযরত ঈসা (আঃ) আসবেন। এটা কুরআন ও হাদীস বিরোধী বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) স্পষ্ট বলছেন, এ উম্মতের মাঝ থেকে এদের সংস্কারক আবির্ভূত হবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও মসীহ্ মাওউদ বলেন, "হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না, খোদাতাআলা এমন প্রয়োজনের সময়ে এবং এ গভীর অন্ধকারের যুগে এ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রেরণ করেছেন। সর্বসাধারণের কল্যানার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্যে এবং হযরত খায়রুল আনামের [সৃষ্টির সেরা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ

(সঃ)-অনুবাদক] নূর প্রচারের উদ্দেশ্যে, এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতো যে, সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, তিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং একে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতিবিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি এ অন্ধকার দর্শন করে এবং ভিতর ও বাইরের আপদসমূহ দেখেও চুপ করে থাকতেন। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি, এ পবিত্র রসূলের যদি সেই পরিষ্কার ও অতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন" - তবেই এটা বিস্ময়ের বিষয় হতো।

অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় বরং হাজার কৃতজ্ঞতা বা খোদাতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করার সুযোগ যে, খোদাতাআলা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিট বিলম্ব ঘটতে দেন নি। কেবল তিনি যে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখিয়েছেন তা নয় বরং তিনি শত শত ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক বিষয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং কৃতজ্ঞতাভরে সিজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের মাননীয় পূর্বপুরুষগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গিয়েছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছো। এখন এর যথোচিত সমাদর করা বা না করা, এবং এটা হতে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। আমি বার বার এ কথা বলতে চাই এবং এ ঘোষণা হতে আমি কখনও বিরত হতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথা সময়ে জগৎ সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে" (ফতেহ্ ইসলাম)।

আল্লাহ্ করুন যেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া যুগ-ইমামকে চিনে তাঁর হাতে বয়াত হয়ে উম্মতে ওয়াহেদাতে রূপান্তরিত হয়, আমীন।

(পুনঃ প্রকাশ)

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(১০ম কিস্তি)

পরিশিষ্ট

এ পুস্তিকার শেষভাগে প্রকৃত মুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করা আমার মতে আবশ্যক। ধর্মবাদীগণ মুক্তির জন্যেই নিজ নিজ ধর্মমত মেনে চলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মানুষই মুক্তির মূল মর্ম অবগত নন। অনেকে আবার এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। খ্রীষ্টানগণ বলেন, পাপের প্রতিফল হতে রক্ষা পেলেই মুক্তি হয়। কিন্তু আমার মতে পাপের প্রতিফল হতে মুক্তি লাভ হলেই স্বর্গলাভ হয় না। ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা, মিথ্যাসাক্ষ্য ও নিজ নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস মতে অন্যান্য মন্দ কর্মে রত না হলে যে মানুষ মুক্তি পেল, এ কথা সত্য নয়। যে অসীম অনন্ত আনন্দময় অবস্থা অর্জনের প্রবল পিপাসা ও তীব্র ক্ষুধা মানব-স্বভাবে চির-নিহিত, যা শুধু খোদার ব্যক্তিগত ভালবাসা, পূর্ণজ্ঞান ও তাঁর সাথে পূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের বলেই পাওয়া যায়, মানব হৃদয় ও খোদার আত্মা উভয়ই প্রেমে বিগলিত না হলে যা লাভ করা অসম্ভব, তারই নাম মুক্তি। কিন্তু যা পরিণামে তার অসীম দুঃখ-কষ্টের কারণ হবে, অনেক সময় ভ্রমবশতঃ মানুষ একেই আনন্দময় অবস্থা অর্জনের একমাত্র উপায় মনে করে এবং পৃথিবীতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই অনন্ত সুখের কারণ বলে কল্পনা করে। আর দিন-রাত মদিরা পানে ও ইন্দ্রিয় সেবনে রত থাকে। এ দোষে পরিশেষে নানা প্রকার প্রাণনাশক রোগে আক্রান্ত হয়। তারা পক্ষাঘাত, অপস্মার, অন্ত্র বা যকৃতের ফোড়ায় আক্রান্ত হয়ে কিংবা গরমী ও প্রমেহের লজ্জাজনক রোগে ভুগে এ দুনিয়া হতে চিরতরে বিদায় নেয়। তাদের শক্তিগুলো অসময়ে ক্ষয় পায় বলে তারা স্বাভাবিক দীর্ঘায়ু লাভ করতে সক্ষম হয় না। অবশেষে তারাও অসময়ে একথা বুঝে নিতে সমর্থ হয় যে, যাকে তারা অনন্ত আনন্দের উপকরণ বলে মনে করত তা-ই তাদের ধ্বংসের মূলীভূত কারণ ছিল। কেউ কেউ দুনিয়ার মান-সম্মান ক্ষমতা সুনাম ও উচ্চপদকেই আসল আনন্দের কারণ মনে করে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। অবশেষে অনুতাপ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেউ কেউ ধনোপার্জনকে প্রকৃত সুখের কারণ মনে করে দিনরাত এতেই রত থাকে কিন্তু অবশেষে সমুদয় সংগৃহীত ধনরত্ন পরিত্যাগ করে অতিশয় দুঃখে, অত্যন্ত কষ্টে ও ঐকান্তিক অনিচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। অতএব কেমনে সেই অনন্ত আনন্দময় অবস্থা অর্জন করা সম্ভবপর হবে সত্যান্বেষণকারীকে তা ভেবে দেখা একান্ত আবশ্যক। ফলতঃ এ অনন্ত ও চিরস্থায়ী আনন্দের অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয়াই সত্য ধর্মের লক্ষণ। যে প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান পরমাত্মীয় পরমেশ্বরের যে পবিত্রপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রেম ও পূর্ণ বিশ্বাস মানব-হৃদয়ে প্রেমোচ্ছ্বাস সৃজন করতে সক্ষম হয় তা-ই যে উক্ত নিত্য আনন্দময় অবস্থা, আমরা শুধু কুরআনেরই সহায়তায় উক্ত নিগুঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এ কয়েকটি কথা, বলতে অতি অল্প বটে, কিন্তু এর সারমর্ম বর্ণনা করতে এক দপ্তরেও কুলাবে না।

খোদার মা'রেফতের (প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞানের) কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এক লক্ষণ এরূপ এতদ্দ্বারা তাঁরই শক্তি, একত্ব, জ্ঞান, সৌন্দর্য ও গুণে কোনরূপ অপূর্ণতার কালিমা বা কলঙ্ক থাকা সম্ভবপর বলে কোনরূপ সন্দেহ জন্মিবে না। নিখিল বিশ্বের সকল পরমাণু যাঁর আদেশে পরিচালিত জগতের যাবতীয় আত্মা, স্বর্গমর্ত্যের যাবতীয় দেহ যাঁর অধীন, কারও যদি শক্তি জ্ঞান ও ক্ষমতা অপূর্ণ হয়, তবে তাঁর পক্ষে এ আধ্যাত্মিক ও শারীরিক জগতগুলোর শাসন কার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে। (খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি) কেউ যদি পরমাণুগুলি ও তাদের সমুদয় শক্তি, আত্মাগণও তাদের সকল শক্তি স্বতঃপ্রসূত বা স্বয়ম্ভু বলে বিশ্বাস করে তবে তাতে খোদার জ্ঞান, একত্ব ও শক্তি তিনটিই অপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হবে। আত্মা ও পরমাণুগণ যদি খোদার সৃষ্ট বস্তুই না হয়, তবে তিনি যে এগুলোর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকবেন একথা দৃঢ়-বিশ্বাস করার কোনই কারণ দেখা যায় না। তার এমন জ্ঞানের কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া দূরের কথা, এ বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতারই

বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব আমাদের মত তিনিও এগুলোর মূলতত্ত্ব অবগত নন, তাঁর জ্ঞানও এগুলোর গুপ্ত ও দুর্ভেদ্য রহস্য উদঘাটন করতে সমর্থ হয় নি, একথা বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হবে। কোন ব্যক্তি আপন হতে ঔষধ তৈরী করলে, তার চোখের সামনে তার হুকুম মতে কোন সিরাপ, শরবৎ, বড়ি বা আরক তৈরী হলে, যে স্বয়ং ব্যবস্থাদাতা বলে এটা অমুক ঔষধ অমুক অমুক ওজনে ও পরিমানে প্রস্তুত, একথা বেশ বলতে পারবে। কিন্তু কোন আরক, বড়ি বা শরবৎ যদি এমন অজানাভাবে তৈরী করা হয় যে, তিনি এগুলো প্রস্তুতও করেন নি, এর অংশে বিভাগ করতেও সক্ষম হন নি, তবে তিনি নিশ্চয়ই এসব ঔষধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবেন। খোদাকে পরমাণু ও আত্মাগণের সৃজনকারী স্বীকার করলে, তিনি এগুলোর নিগুঢ় শক্তি ও ক্ষমতাসমূহ সম্পূর্ণ অবগত, একথাও স্বতঃসিদ্ধ হয়, কেননা তিনিই স্বয়ং উক্ত ক্ষমতা ও শক্তিসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট-বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারেন না। কিন্তু তাকে যদি এগুলোর সৃষ্টিকর্তা বলে অস্বীকার করা হয়, তবে এগুলো সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণজ্ঞান থাকবে, একথার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিনা প্রমাণে যদি কেউ বলে তার এ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান আছে তবে সেটা শুধু তারই নিজের একগুঁয়ে মত ও প্রমাণবিহীন দাবীমাত্র। সৃষ্টিকর্তার অবশ্যই সৃষ্ট-বস্তুর জ্ঞান থাকবে। কিন্তু খোদা যা নিজ হাতে সৃষ্টি করেন নি তিনি এগুলোরও পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী, কেউ কি এমন মতের কোন প্রমাণ প্রদান করতে সক্ষম হবেন? এর গুণ ও শক্তিসমূহ খোদা হতে অভিন্ন হলে, যেমন তিনি নিজ অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত আছেন তেমন এদের অস্তিত্ব বিষয়েও সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকতেন। কিন্তু আর্য সমাজের বিশ্বাস মতে এরা পরমেশ্বর হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেরাই অস্তিত্বের ঈশ্বর ও প্রত্যেকেই অনাদি, অনন্ত, অসৃষ্ট, নিত্য। সুতরাং পরমেশ্বরের সাথে এরা এতই সংস্রবশূন্য যে উক্ত পরমেশ্বরের মৃত্যু হলেও এদের কিছুই ক্ষতি নেই। পরমেশ্বর উক্ত শক্তি ও ক্ষমতাসমূহ সৃষ্টি করেন নি বলে যেমন সৃষ্টির সময় তার কোন আবশ্যকতা ছিল না তেমন রক্ষার সময়ও তাঁর কোন আবশ্যকতা হবে না। কুরআনে খোদার নাম 'হাইয়্যুন' ক্বইয়ুমুন'। 'হাইয়্যুন' অর্থাৎ স্বয়ং নিজ গুণে সজীব ও অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের জীবনদাতা। 'ক্বাইয়্যুমুন' শব্দের অর্থ স্বয়ং নিজগুণে চিরস্থায়ী ও যাদেরকে জীবনদান করেছেন তাদের স্থায়িত্বদাতা। যারা খোদার এ জীবনদাতা নামের জ্যোতিঃ লাভ করে শুধু তারাই তাঁর স্থায়িত্বদাতা নামে জ্যোতিঃ লাভের উপযোগী। খোদা শুধু তাঁর সৃষ্ট-বস্তুকেই স্থায়িত্ব প্রদান করতে সক্ষম। তিনি যা সৃষ্টি করেন নি তা চিরস্থায়ী করতে পারেন না। যিনি খোদাকে 'হাইয়্যুন' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করেন, তিনি তাকে 'ক্বাইয়্যুমুন' অর্থাৎ রক্ষাকর্তা বলে দাবী করতে পারেন, কিন্তু যিনি তাকে সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন না তিনি তাঁকে রক্ষাকর্তা বলেও দাবী করতে পারেন না। খোদা কোন বস্তুর রক্ষাকর্তা। এর অর্থ এই, তিনি রক্ষা না করলে সে বস্তু অস্তিত্ববিহীন ও শূন্য হবে। কিন্তু যিনি অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্য খোদার মুখাপেক্ষী ছিলেন না, তিনি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেন তাঁর মুখাপেক্ষী হবেন? অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত যদি পরের সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্যও পরের সহায়তার প্রয়োজন ছিল। ফলতঃ খোদার 'হাইয়্যুন' ও 'কাইয়্যুমুন' নামদ্বয় জ্যোতিঃ বিকিরণে ও গুণ-প্রসারণে পরস্পর অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, কখনও বিচ্ছিন্নভাবে জ্যোতির বিতরণে সক্ষম নয়। যারা বস্তুতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণু ও আত্মাগণের সৃষ্টিকর্তা বলে অবিশ্বাস করে তারা যদি জ্ঞান ও বুদ্ধির অপব্যবহার না করে, তবে তিনি তাদের রক্ষাকর্তা, এ কথাও অস্বীকার করতে বাধ্য হবে। অতএব পরমাণু ও আত্মাগণ পরমেশ্বরের সাহায্যে রক্ষিত হচ্ছে তারা এমন দাবী করতে পারবে না। কারণ ন্যায়তঃ পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুই তার সহায়তা প্রার্থী হয়, যার সৃষ্টির নিমিত্ত পরমেশ্বরের সহায়তার আবশ্যকতা ছিল না তার রক্ষার নিমিত্ত কেন তাঁর সহায়তার আবশ্যকতা হবে– এমন অসঙ্গত দাবীর কোনই প্রমাণ বিদ্যমান নেই। (চলবে)

চলিতকরণ ও সম্পাদনা - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
অনুবাদ - মোঃ আজিম উদ্দীন

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

[মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তানে]

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

এ এসবই হলো হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের আকিদা-বিশ্বাস। যদিও একজন দুর্বল বিনম্র মানুষকে খোদা বলাটা খ্রীষ্টানদের এক বড় ধরনের ভুল, কিন্তু একজন রক্তপাতকারী ইমাম মাহ্দী ও রক্তক্ষরণকারী মসীহ্ (-এর আগমন) সম্পর্কে আহলে হাদীস ফির্কাসহ (যাদেরকে ওহাবীও বলা হয়) কিছু সংখ্যক অন্যান্য ফিরকার মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমূল এ সকল আকীদা বিশ্বাস তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার ওপর অত্যন্ত মন্দ প্রভাব ফেলছে- এত বেশি মন্দ প্রভাব যে, এর কারণে তারা যেমন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির মাঝে সচ্চেতনা ও সততার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানে বাস করতে পারে না, তেমনি কোন অমুসলিম সরকারের অধীনেও সত্যিকার আনুগত্য ও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে বসবাস করতে পারে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এত কঠিন বলপ্রয়োগে বিশ্বাস যে, তাদেরকে হয়তো তখন তখনই মুসলমান হতে হবে, নইলে তাদেরকে হত্যা করা হবে এমন ধর্মবিশ্বাস যে নিতান্তই আপত্তিকর তা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনায়াসে স্বীকার করবেন, কারও কোন ধর্মের সত্যাসত্য যাচাই ও এর শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি করার এবং এর কল্যাণ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পূর্বেই কোন ব্যক্তিকে কেবল জোর-জবরদস্তি ও হত্যার হুমকির মাধ্যমে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করা অত্যন্ত অপছন্দীয় পন্থা। এরূপ পন্থায় ধর্মের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা বরং উল্টো এর প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে আপত্তি করার সুযোগ করে দেয়া হয়। এমন রীতি-নীতির শেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি অন্তর থেকে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। দয়া, নম্রতা ও ন্যায়বিচার-মানবতার এ সকল বিশেষ চারিত্রিক গুণ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, আর এর পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহিত সাধন স্পৃহা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেবল হিংস্রতা অবশিষ্ট থেকে যায় এবং উচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। কিন্তু সুস্পষ্ট যে, ওরূপ রীতি-

নীতি সেই খোদাতাআলার পক্ষ থেকে (গণ্য) হতে পারে না, যিনি নিজেও কোন প্রকার শাস্তি কেবল চূড়ান্তভাবে যুক্তি প্রতিষ্ঠার পরেই দিয়ে থাকেন। চিন্তা করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন এক ধর্ম এজন্য গ্রহণ করে না যে, সে এর সত্যতা, এর পবিত্র শিক্ষা এবং এর সৌন্দর্য ও সদগুণাবলী সম্বন্ধে এখনও অজ্ঞ, তাই বলে কি ওরূপ ব্যক্তির সাথে এ আচরণ সমীচীন হতে পারে যে, তখন তখনই তাকে হত্যা করা হয়? বরং ওরূপ ব্যক্তি তো করুণার পাত্র এবং তার কাছে যেন নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে সে ধর্মের সত্যতা, গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকারিতা সম্যকভাবে উপস্থাপন করা হয় এ ব্যাপারে তার অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে তার অস্বীকারের জবাব তলোয়ার অথবা বন্দুকের মাধ্যমে দেয়া কখনও উচিত নয়। অতএব এ যুগের এ সকল ইসলামী ফির্কার জিহাদ সংক্রান্ত মতবাদ আর সেই সাথে তাদের এ শিক্ষা যে, শীঘ্রই সেসময় আগত প্রায় যখন এক রক্তপাতকারী মাহ্দীর জন্ম হবে যার নাম হবে ইমাম মুহাম্মদ এবং মসীহ্ (ঈসা) তার সাহায্যার্থে আকাশ থেকে নামবেন এবং উভয়ে মিলিত হয়ে দুনিয়ার সকল বিধর্মী জাতিকে ইসলাম অস্বীকার করার কারণে হত্যা করবেন- এহেন মতবাদ নিঃসন্দেহে চরম পর্যায়ের নৈতিকতা বিরোধী। এটা কি সেই আকীদা-বিশ্বাস নয় যা মানবতার সকল কোমল বৃত্তি ও পবিত্র চেতনাকে নস্যাৎ করে আর হিংস্র পশু-সুলভ প্রবৃত্তিগুলোর জন্ম দেয়? এহেন আকীদায় বিশ্বাসীদেরকে প্রত্যেক জাতির সঙ্গে মুনাফেকী ও কপটতাপূর্ণ জীবন যাপনে বাধ্য করে, এমন কি বিজাতীয় শাসকদের সাথে তাদের পক্ষে অকপট আনুগত্যপূর্ণ আচরণও অসম্ভব হয়ে পড়ে, বরং অসততা ও মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে এক মিথ্যা আনুগত্য দেখানো হয়। এ কারণেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায়- আগেই যেমন ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি - আহলে হাদীসদের কোন কোন ফির্কা * ইংরেজ সরকারের অধীনে দ্বিমুখী ধরনের (নীতি পালনে) জীবন যাপন করছেন, অর্থাৎ গোপনে তারা জনগণকে সে একই রক্তপাতের (আসন্ন) যুগের নিশ্চিত আশ্বাস দিতে থাকেন। তারা রক্তপাতকারী মাহ্দী ও রক্তক্ষরণকারী মসীহ্র (আবির্ভাবের) জন্য অপেক্ষামান রয়েছেন, আর সে অনুযায়ী-ই মস্‌লা (রীতি-নীতি) শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আবার শাসকদের সামনে তোষামোদি ভূমিকায় উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমরা ওরূপ আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী।' কিন্তু তারা যদি সত্য সত্যই বিরোধী হয়ে থাকেন তাহলে কী কারণে তারা তাদের লেখার ও প্রকাশনার মাধ্যমে সাধারণভাবে এর প্রচার-প্রচারণা করেন না? আর কী কারণে তারা আগমনকারী খুনী মাহ্দী ও মসীহ্র জন্য এমনভাবে অপেক্ষা করছেন, যেন তাঁদের সাথে তাঁদের রক্তক্ষয়ী অভিযানে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে দোরগোড়ায় এক পা দাঁড়িয়ে আছেন? মোট কথা, উল্লেখিত আকীদা-বিশ্বাস এই শ্রেণীর মৌলবী - মাওলানাদের যথেষ্ট নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটিয়েছে। তারা মানুষকে নম্রতা, শালীনতা ও শান্তিপ্রিয়তার শিক্ষা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। বরং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অহেতুক হত্যা করাকে তাদের দৃষ্টিতে ধর্মপরায়ণতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের এক অবশ্য-কর্তব্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আহলে হাদীসের কোন ফির্কা এসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধী হলে আমরা তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হব। কিন্তু আফসোসের সাথে এ কথা বর্ণনা না করে পারছি না যে, আহলে হাদীসের মাঝে সেসব (উগ্রপন্থী) ওহাবীও রয়েছেন যারা গোপনে এক রক্তপাতকারী মাহ্দীর আবির্ভাবেও জেহাদের তথাকথিত মতবাদে বিশ্বাস করেন। তারা এর যথার্থ ও প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী, এবং সুযোগ মত অন্যান্য সকল ধর্মের সকল অনুসারীকে হত্যা করে ফেলা অনেক বড় সওয়াব ও পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। অথচ ইসলামের নামে হত্যা অথবা রক্তপাত ও রক্তপাতের হুমকির মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ও উন্নতি সাধন করবেন এমন কোন খুনী মাহ্দী বা মসীহ্র আগমন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে বিশ্বাস রাখা এসবই কুরআন মজীদ ও সহী (প্রামাণ্য) হাদীসাবলীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়ায্যামায় এবং তারপরও কাফিরদের হাতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। বিশেষতঃ মক্কার তের বছর মহাবিপদ ও প্রত্যেক প্রকারের যুলুম-নির্যাতন ভোগের মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হয়, যা কল্পনা করতেও কান্না আসে। কিন্তু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করেন নি এবং তাদের কঠোর গালমন্দের কঠোর উত্তরও দেন নি যতক্ষণ পর্যন্ত বহু সংখ্যক সাহাবা, তাঁর প্রিয় বন্ধু ও ভক্তদেরকে বড়ই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা না করা হয় এবং বিভিন্নভাবে তাঁকেও দৈহিক কষ্ট না দেয়া হয়। আর কয়েক বার তাঁকে বিষও প্রয়োগ করা হয় এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য কয়েক প্রকার (ফন্দি-ফিকির ও) প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, সেগুলোতে বিরুদ্ধবাদীদেরকে বিফল মনোরথ হতে হয়। (অবশেষে) যখন খোদাতাআলার প্রতিশোধ ও শাস্তিদানের সময় এলো তখন এমনটি ঘটলো যে, মক্কার প্রধানরা ও জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে এ ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলা উচিত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তখন খোদাতাআলা যিনি তাঁর প্রিয়দের, তাঁর সিদ্দীক- সত্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান বান্দাদের সহায়ক হয়ে থাকেন তিনি তাঁকে জানান, এ শহরে এখন যেহেতু পাপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আর এর নাগরিকরা হত্যাযজ্ঞে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেহেতু তিনি যেন অনতিবিলম্বে এ শহর ছেড়ে চলে যান। অতএব ঐশী আদেশে তখন তিনি মদীনায় হিজরত করে যান। কিন্তু তবুও তাঁর শত্রুরা তাঁকে ছেড়ে দেয় নি। বরং তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং যে করেই হোক ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল। আর যখন তাদের বাড়াবাড়ি চরম সীমায় পৌছে গেল এবং বহু নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষকে হত্যা করার অপরাধেও তারা নিজেদেরকে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য করে তুললো, তখন প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষামূলক অধিকাররূপে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। তদুপরি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই শুধুমাত্র দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে বহুসংখ্যক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার এবং তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার দরুন তারা নিজেরা ও তাদের সাহায্যকারীরা অনুরূপ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের সময়ে আমাদের নবী সল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লাম সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ (রাঃ) ধর্ম বিস্তারের জন্য কখনও যুদ্ধ করেছিলেন অথবা কাকেও জবরদস্তি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়েছিলেন এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল এবং অন্যায়। (চলবে)

অনুবাদ- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

** টীকা ঃ আহলে হাদীসদের কেউ কেউ অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে অন্যায়ভাবে নিজেদের রচিত বই-পুস্তকে লিখেছেন, অচিরে মাহ্দী আবির্ভূত হবেন। তিনি ভারতবর্ষের শাসক ইংরেজদেরকে বন্দী করবেন। আর তখন খ্রীষ্টান বাদশাকে গ্রেফতার করে তার সামনে হাযির করা হবে। এসবপুস্তক এখনও এ আহলে হাদীসের বাড়ী-ঘরে মজুদ রয়েছে। সেগুলোর মাঝে ইক্তারাবুস সা'আ' হচ্ছে এক অতি বিখ্যাত আহলে হাদীস রচিত কিতাব। এর ৬৪ পৃষ্ঠায় এ বর্ণনাই লেখা আছে- গ্রন্থকার।*

আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'খবীর'-এর ব্যাখ্যা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক
৯ মে, ২০০৩ইং তারিখে লন্ডনে মসজিদ ফযল প্রদত্ত

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পরে সূরা নিসার ১৩৬ আয়াত পাঠ করে হুযূর খুতবা প্রদান করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٦﴾

অনুবাদ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষ্য হিসাবে ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও যদিও তোমাদের [তোমাদের সাক্ষ্য] নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায়। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হবে) সে যদি ধনী হয় অথবা দরিদ্র তাহলে আল্লাহ্ তাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং তোমরা হীন কামনার অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পার। এবং তোমরা কথা পেঁচিয়ে (সত্যকে) গোপন করলে অথবা এড়িয়ে গেলে (জেনে রাখ) তোমরা যা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) সিফতে বারীতাআলার ওপরে যেমন খুতবা দিয়ে যাচ্ছিলেন আমিও আপাতত সিফতে বারী তাআলার উপরে বক্তব্য জারী রাখতে চেষ্টা করব। আল্লাহ্‌র সিফত 'খবীর' সম্পর্কে হযরত সাহেব (রাহেঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি আয়াত পড়েছি, অনুবাদও পড়েছি।

দুঃখের বিষয় এই যে, আজ মুসলমানেরা অন্যান্য অনেক নির্দেশনার ন্যায় এ নির্দেশকেও ভুলে গেছেন। তারা মনে করেন, তারা যা কিছু করছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ্ (হয়ত) অবগত নন। তাদের ধারণা এই যে, তারা যেসব নির্দেশকে ঐশী নির্দেশ মনে করেন সেগুলোই ঐশী নির্দেশ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ইন্‌তেকালের খবর শুনে পাকিস্তানের কোন কোন পত্রিকা যে ধরনের জঘন্য অপপ্রচার চালিয়েছে তার উপর **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন** পড়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। পূর্বে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এমনই হবার ছিল। এমন দৃশ্য দেখে আমাদের ঈমান আরো সতেজ হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা আলীম ও খবীর এসব বিষয়ে বহুপূর্বেই আঁ হযরত (সঃ)-কে খবর দিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আমরা সেগুলো পূর্ণ হতে দেখছি।

আঁ হযরত (সঃ) আজকের মুসলমানদের মাঝে যে ধরনের পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আজকের মুসলমানদের মাঝে যে ধরনের পরিবর্তনের কথা আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, তার মাঝে একটি এই যে, মানুষ যাকাতকে জরিমানাস্বরূপ মনে করবে। ... আজকাল যেমন চারপাশ থেকে মুসলমানদেরকে বিপদ ঘিরে ফেলছে, এমন সময় যাকাত ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হয় না এবং অধিকাংশ মুসলমান যাকাত দিতে চায় না। অথচ যাকাত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ফরয করা হয়েছে। যেখানে ইসলামী নির্দেশমতে যাকাত নেয়া হয় সেখানে অনেক সময় মন না চাইতেও কিছু কিছু যাকাত প্রদান করা হয়। কিন্তু যাকাত নেয়ার ব্যবস্থা নেই যেখানে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সেখানে মানুষ যাকাত দেয় না। যারা যাকাত দেন তারাও এটাকে নিজেদের প্রকাশের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবে তা আদায় করে যে, অপর পক্ষ যাকাত মনেই করে না। বরং তারা জাতীয় পর্যায়ের কিছু কার্যক্রমের জন্য চাঁদা মনে করে।

পাকিস্তানে যখন থেকে ইসলামী আইন চালু করা হয়েছে, যাকাতকেও আবশ্যক করা হয়েছে। অবস্থা সেখানে এরকম যে, আহমদীরা অমুসলিম। কিন্তু অনেকে যাকাত দেয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাংকে নিজেকে আহমদী বলে প্রকাশ করে (অথচ তারা আহমদী নয়) অথবা যে তারিখে যাকাত ব্যাংকে কেটে নেয়া হবে অনেকে সে তারিখের দু'দিন আগে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থেকে তুলে নিয়ে যায়। অথবা যারা যাকাত দিলেন তারা লোক দেখাবার জন্য দিলেন যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন। আবার দেখা যায়, যেহেতু সঠিক ব্যবস্থাপনা নেই, পত্রিকায় যাকাত বিতরণের খবর প্রকাশ হয়। যেখানে যাকাত বিতরণ হয় সেখানে মহাহাঙ্গামা হট্টগোল সৃষ্টি হয়ে যায়। পরস্পর হাতাহাতি মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ এসে গেল, আমি যখন ঘানায় (আফ্রিকা) ছিলাম, অনেক অ-আহমদী সম্পর্কিত মুসলমান ভাই যাকাতের টাকা আমাদের জামাতের যাকাত ফান্ডে দিতে আসেন। তারা বলেন, আহমদী জামাতের যাকাত ফান্ডে যাকাত দিলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, এ টাকা যথাস্থানে সুচারুরূপে খরচ হবে। অন্যথায় আমাদের আলেমদেরকে দিলে কোন নিশ্চয়তা থাকে না যে, এ টাকা যথারীতি সঠিকভাবে খরচ হবে। কারণ সেখানে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কারণে সঠিক বন্টনের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী করি আমরা, আর যতই শোকরগুযারী করি তা যথেষ্ট হবে না। আমাদের অনেক বেশি শোকরগুযারী করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে এমন সুন্দর নেযাম [নেযামে খিলাফত] দিয়েছেন, নেযামের মাঝে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন, যেখানে খলীফার নেগরানীও সুব্যবস্থার মাঝ দিয়ে জামাতের প্রতিটি পয়সা আল্লাহ্‌র ফযলে খুব চিন্তা-ভাবনা করে খরচ করা হয়।

আল্লাহ্‌র সিফত খবীর সম্পর্কে আরো আয়াত পেশ করছিঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣١﴾

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় তোমার প্রভু যার জন্য চাহেন রিয্ক সম্প্রসারিত করেছেন এবং [যার জন্য চাহেন] একে সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষণকারী (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১)।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٤﴾

অনুবাদ ঃ তোমরা কি দেখ নি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন যার ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম সূক্ষ্মদর্শী সবিশেষ খবর রাখেন (সূরা হজ্জ ঃ ৬৪)।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

অর্থ ঃ এবং তুমি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা রাখ যিনি কখনও মরেন না এবং তাঁর প্রশংসার সাথে তসবীহ্ পাঠ কর। বস্তুতঃ তিনি নিজ বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট (সূরা ফুরকান ঃ ২৫ঃ৫৯)।

আল্হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ এ সিফতের প্রকাশ ও বিকাশ অনেক অনেক দেখিয়েছেন। কুরআনের এ বর্ণনা কেবল মু'মিনদের জন্যই নয়। আমাদের ঈমানের উন্নতির জন্য বিরোধীদের আপত্তির জবাব দেবার জন্যও যথেষ্ট।

প্রত্যেক পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্র এসব পবিত্র সিফত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাঝেও বিকশিত হয়েছে। অনেক অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা সেযুগে সাহাবায়ে কেরামও হয়ত সঠিক অনুমান করতে পারেন নি যে, কী হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١٢﴾

অর্থাৎ এবং যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে (সূরা তাকভীর ঃ ১২)। আকাশের রহস্য উদঘাটন করা আকাশের আবরণ তুলে ফেলারই নাম। সে যুগে মানুষ কি বুঝেছে যে, আকাশের আবরণ কীভাবে তুলে ফেলা হবে যখন দূরবীণ ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কার হয় নি।

ইটালীর বিজ্ঞানী ১৬০৯ইং সনে দূরবীণ আবিষ্কারের পর থেকে আকাশের রহস্য উদঘাটন হতে শুরু হয়েছে। সেনসপস্ চাঁদে পাহাড়ের অবস্থান ইউরেনাসের চার চাঁদ আবিষ্কার, অনুরূপভাবে আকাশের আরো কত শত রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। আগামীতে আরো বহু কিছু আবিষ্কার হবে, বর্তমানেও হচ্ছে এসব খবর কুরআন শরীফে দেয়া হয়েছে। যেমন রেডিয়েশনের আবিষ্কার এটম বোমা (পারমাণবিক যুদ্ধের যন্ত্রপাতি) ইত্যাদি। বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٩﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿١٠﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١١﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١٢﴾

অর্থাৎ সেদিন আকাশ হবে বিগলিত তামার ন্যায় এবং পর্বতসমূহ হবে ধূণিত পশমের ন্যায়। এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে না। (যদিও) তাদেরকে তাদের বন্ধুর অবস্থা খুব ভাল করে দেখানো হবে। প্রত্যেক অপরাধী কামনা করবে হ্যায়, সে যদি সেদিনের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফিদিয়া হিসাবে নিজ সন্তানদেরকে পেশ করতে পারত ! (সূরা মাআরিজ ঃ ৯-১২)

যখন পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন খুব সম্ভব আকাশ বিগলিত তাম্রের ন্যায় দেখা যাবে। এর মধ্যে রেডিয়েশনের ধ্বংসাত্মক আযাবের প্রতি ইঙ্গিত আছে। অত্যন্ত ভয়াবহ আযাব। এ যাবত যেখানে যেখানে সামান্য দেখা গেছে সেখানে এমন হয়েছে যে, কোন খুব আপনজন ও তার আপন জনের খবর জানতে চায় না। এমনি মায়েরা নিজ সন্তানদের ভুলে গেছে। এতে এত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যে, কেউকে জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে যে, নিজ সন্তানের বিনিময়েও নিজের নিরাপত্তা কামনা করবে, কোন মতে যদি এ ভয়ঙ্কর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

যেখানে যেখানে দেখা গেছে, সেখানে খুবই স্বল্প শক্তির বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এ যুগে তো তার চেয়ে বহু গুণ বেশি শক্তিশালী বোমা তৈরি হয়েছে। আজকাল পৃথিবীর যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তা এই যে, খুব দ্রুত এ পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অতএব আজও আগের মতই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকলের ফরয, যাদের অন্তরে মনবতার প্রতি সহানুভূতি রয়েছে তারা পৃথিবীর মানুষের রক্ষার জন্য দোয়া করবেন, বেশি বেশি দোয়া করবেন। মানুষ তার স্রষ্টাকে যেন চিনতে পারে এবং যতদূর সম্ভব বেশি বেশি মানুষ ভয়াবহ পরিণতি থেকে যেন রক্ষা পায়।

হযরত মহানবী (সঃ) আল্লাহ্র তরফ থেকে খবর পেয়ে যেসব খবর ভবিষ্যদ্বাণী আকারে বর্ণনা করেছেন তার কয়েকটি এখানে পেশ করছিঃ

মুশরিকদের বড় বড় নেতারা কে কোথায় মারা পড়বে তা রসূলে করীম (সঃ) আগেই বলে দিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, 'আমরা হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যকার এক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত উমর (রাঃ) বদরের যুদ্ধের ঘটনা বলতে লাগলেন। বললেন, আঁ হযরত (সঃ) বদরের যুদ্ধের একদিন পূর্বে মক্কার নেতাদেরকে কোন্ স্থানে মরে মরে পড়ে থাকবে-সেসব স্থান দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্ যদি চান তবে আগামীকাল অমুক অমুক নেতা সেই সেই স্থানে মরে পড়ে থাকবে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, যিনি আঁ হযরত (সঃ)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছিলেন, আমরা পরের দিন যুদ্ধ শেষে দেখলাম, ঠিক সেই সেই স্থানে সে নেতারা মরে পড়েছিল। পরবর্তীতে তাদেরকে একগর্তে মাটি দেয়া হোল। আঁ হযরত (সঃ) সে স্থানে আসলেন, তারপর সেসব মৃতদেহকে সম্বোধন করে এক একজনের নাম দু'দু'বার করে উচ্চারণ করে বললেন, অমুকের পুত্র অমুক তুমি কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতিগুলোকে সত্য দেখতে পাও নি, যা তিনি তোমাদের সাথে করেছিলেন? আমি তো আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্যিকার দেখতে পেয়েছি যা তিনি আমার সাথে করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন? হুযূর আপনি কি মৃতদের সাথে কথা বলছেন- যাদের মাঝে রূহ নেই? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তোমরা আমার কথাকে তাদের চেয়ে বেশি করে মান্ছ না। আল্লাহ্ সে ব্যবস্থা করেছেন।'

আঁ হযরত (সঃ) ইয়ামন, সিরিয়া রাজ্য বিজয়ের খবর আগেই দিয়েছিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। খন্দকের যুদ্ধের জন্য খন্দকের খনন কাজ চলছিল। এমন সময় এক স্থানে একটি বড় কঠিন শক্ত পাথর খনন কাজে বাধা সৃষ্টি করল। আঁ হযরত (সঃ) আমার হাত থেকে কোদাল নিয়ে নিলেন এবং সেই পাথরের ওপর কোদালের আঘাত করলেন। পাথর থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হোল। তিনি আবার আঘাত করলেন। আবার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হোল। তৃতীয়বারও এমন হোল।

হযরত সালমান (রাঃ) বললেন, 'আমার বাবা মা আপনার জন্য কুরআন হোক ইয়া রসূলাল্লাহ্! এ কি ধরনের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হোল? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তুমিও দেখেছ স্ফুলিঙ্গ? হযরত সালমান বললেন, জী হ্যাঁ। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'প্রথম যখন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হোল এর আলোকে আল্লাহ্ আমাকে ইয়ামনের বিজয়ের খবর দিয়েছেন। দ্বিতীয়বারের স্ফুলিঙ্গে সিরিয়া ও পশ্চিমের দেশগুলোর বিজয়ের খবর দিয়েছেন। আর তৃতীয়বারের স্ফুলিঙ্গে আল্লাহ্ আমাকে প্রাচ্যের দেশগুলোর বিজয়ের খবর দিয়েছেন। দেখুন, তার পরিবর্তে আল্লাহ্ কত গৌরবের সাথে আঁ হযরত (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণতা দিয়েছেন!

হযরত যয়নব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। একবার আঁ হযরত (সঃ) আমার কাছে আসলেন, হুযূর (সঃ) অস্থিরতাবোধ করছিলেন, বললেন, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আরবের জন্য ধ্বংস নেমে আসবে। সে বিপদের ফলে, যা কাছে এসে গেছে তাতে আজ ইয়া'জূজ মা'জূযের দেয়ালের মাঝে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। আঁ হযরত (সঃ) আঙ্গুলের দ্বারা ছিদ্রের আকার দেখালেন। হযরত যয়নব জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এমন অবস্থায় যখন আমাদের মাঝে অনেকে পুণ্যবান লোক থাকবে!' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপ ও অনাচার পুণ্যকর্মের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে।"

হাতেব বিন আবূ বলতা গোপনে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা অবহিত করে দিলেন। (কুরআন শরীফেও এর উদ্দেশ্য আছে) হাদীসে আছে যে, হাতেব বিন আবি বলতা আঁ হযরত (সঃ)-এর পুরানো সাহাবাদের একজন ছিলেন, হাতেব বিন আবি বলতা মক্কাবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে একখানা পত্র লিখে গোপনে তা পাঠাচ্ছিলেন। তিনি তাতে আঁ হযরত (সঃ)-এর মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযানের কথা লিখেছিলেন। আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্ সেই পত্র সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। আঁ হযরত (সঃ) হযরত আলী এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এবং আরও একজনকে পাঠালেন, যাও অমুক স্থানে এক মুশরিক মহিলাকে পাবে। তার কাছে হাতেব বিন আবি বলতার লেখা সেই মুশরিকানে মক্কার নামে লেখা পত্র পাবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'আমরা ঠিক সেই স্থানে সে মহিলাকে পেয়ে গেলাম, যেখানে আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন। সেই মহিলাকে আমরা পত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে সে সরাসরি অস্বীকার করে বসল। আমরা কঠোর ভাষায় বললাম যে, পত্র অবশ্যই তার কাছে এবং আমরা অবশ্যই তা বের করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবশেষে সে সেই পত্র বের করে আমাদের দিয়ে দিল।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের কারো পাত্রে যদি মাছি পড়ে যায় তবে তা একবার ডুবিয়ে দিয়ে তারপর বের করে ফেলে দাও। কারণ মাছির এক পাখায় (ডানা) রোগ জীবাণু এবং অপর পাখায় এর প্রতিশেধক রয়েছে।" বর্তমান যুগে গবেষণার ফলে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আঁ হযরত (সঃ) যা বলেছেন তা-ই সত্য। মাছির এক পাখায় রোগ জীবাণু অপর পাখায় প্রতিশেধক থাকে।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ বর্তমান যুগের যেসব গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়েছিলেন তা থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে তাঁর পিতার মৃত্যুর খবর আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আমার আব্বাজান শেষবার যখন অসুস্থ ছিলেন (আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে স্থান দিন) একদিন দুপুরে আমি ইলহাম প্রাপ্ত হলাম, " ওয়াস্‌সামায়ে ওয়াত্‌তারেক" আমার অন্তরে জ্ঞান দান করা হোল এ ইলহামে পিতার মৃত্যুর ইঙ্গিত রয়েছে। এর অর্থ এই, আকাশের কসম, সেই দুর্ঘটনার কসম যা সন্ধ্যার পরে ঘটবে।" আল্লাহ্‌র কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যাঁর নামে মিথ্যা রচনা করা শয়তান এবং অভিশপ্তের কাজ।" তারপর লিখেছেন। "আমাকে যখন খবর দেয়া হলো যে, সূর্যাস্তের পরই আমার আব্বা মারা যাবেন- স্বাভাবিকভাবেই আমার অন্তরে দুঃখ বোধ হোল। তাছাড়া আমাদের অর্থ উপার্জনের বড় অংশ তাঁর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল- তাই খেয়াল হোল- তাঁর মৃত্যুর পরে কী হবে? অন্তরে ভয় হোল, এবার হয়ত আর্থিকভাবে কষ্টের দিন আসবে। এ সব খেয়াল মাত্র বিদ্যুত গতিতে এক মুহূর্তে মনে থেকে উঠে গেল- সাথে সাথে পুনরায় ইলহাম নাযেল হোল আলায়সাল্লাহু বিকাফীন আবদাহ্? (আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?) এ ইলহাম প্রাপ্ত হবার সাথে সাথে আমার অন্তরের সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেল যেমন বড় কোন ঘায়ে কোন মলম লাগালে তা ঠিক হয়ে যায়। আমি তখনই জেনে গেলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে বিনষ্ট হতে দেবেন না।'

আমি মালাওয়ামাল নামক কাদিয়ানের অধিবাসী একজন ক্ষত্রিয়কে ডেকে সব বিবরণ শোনালাম। তারপর তাকে পাঠালাম, 'যাও অমৃতসর গিয়ে হাকীম মুহাম্মদ শরীফ কালানুরীকে গিয়ে বল, তিনি যেন এই ইলহামের পবিত্র বাণীকে কোন আংটিতে খচিত করিয়ে তোমাকে দেন এবং তুমি তা নিয়ে আস।' তাকে এ জন্য একাজ দিলাম, সে যেন এই ইলহামের সাক্ষী হয়ে যায় এবং হাকীম মুহাম্মদ শরীফ সাহেবও যেন সাক্ষী হয়ে যান। তারপর যথাসময়ে সে আংটি তৈয়ার হয়ে আমার হাতে এসে গেল। পাঁচ টাকা খরচ হয়েছিল। যে অংশটা এখনও আমার কাছে আছে। সেই হিন্দু ও মালাওয়ামালও জীবিত আছে। এটি একটি নিদর্শন যা এমন সময় ইলহাম হয়েছিল- যখন আমাদের পরিবারের আর্থিক সংগতি আব্বাজানের সামান্য উপার্জনের উপর ছিল। তখন বাইরের কোন লোক আমাকে জানত না। আমি একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ছিলাম। কাদিয়ানের মত অজপাড়াগাঁয়ের নিভৃত কোণে পড়েছিলাম, কেউ জানত না।

তারপর আল্লাহ্‌তাআলার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এক বড় মানব গোষ্ঠী আমার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এমন এমন আর্থিক বিজয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করলেন যার শুকরিয়া জ্ঞাপনের কোন ভাষা আমার জানা নেই। আমার এতটুকুও আশা ছিল না যে, আব্বার পরে দশ টাকা মাসে আয় হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা যিনি গরীবদেরকে ধূলাবালি থেকে তুলে আনেন এবং অহংকারীকে ধূলায় মিশিয়ে দেন। তিনি আমাকে এত বড় সাহায্য ও সমর্থন করলেন, আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, এখানে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। হয়ত বা এর চেয়েও বেশি হবে।"

আজ আপনারা দেখেছেন এখনও কোটি কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। "বছরের পর বছর এমন হয়ে চলেছে যে, প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা খরচ হচ্ছে- কেবল লঙ্গরখানা বাবদ। এটা গড় হিসাব। এ ছাড়া, বই ছাপা, মাদ্রাসার খরচ ও অন্যান্য খরচ পৃথক আছে।" সেই যুগের দেড় হাজারও আজ কয়েক লক্ষ টাকার সমান। "অতএব দেখুন, এ ইলহাম আলাসাল্লাহু বিকাফীন 'আবদাহু আর এ ভবিষ্যদ্বাণী কত বড় গৌরবের সাথে পূর্ণতা পেয়েছে। এটা কি কোন মিথ্যাবাদীর কাজ? অথবা শয়তানের কল্পনাপ্রসূত? কখনও না। বরং এটা সেই খোদার কাজ যাঁর হাতে সকল মান-সম্মান, অথবা বে-ইয্‌যতি, অধঃপতন ও উন্নতি।"

হযরত (আঃ)-এর উল্লেখিত আংটিটি হযরত (আঃ)-এর ইন্‌তেকালের পরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর অংশে এসেছিল। পরবর্তীতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ওসীয়্যত করেছেন যে, এ আংটি খলীফায়ে ওয়াক্‌তের (যুগ খলীফার) হবে। কারো ব্যক্তিগত হবে না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ খলীফাতুল সানী (রাঃ) পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর হাতে এ আংটি ছিল। তারপর সেদিন আপনারা হয়ত (MTA-তে) দেখেছেন যে, আমাকে সেই আংটি পরানো হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ এর কল্যাণকে সবসময় অব্যাহত রাখুন।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) নিজ হাতের পরা এ আংটিটি সবাইকে দেখালেন - অনুবাদক]

রেওয়ায়াত আছে, হযরত শেখ ফযল এলাহী সাহেব (ডাক পিয়ন) বর্ণনা করেছেন। একবার আমি ডাক নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হতে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় ডেপুটি শংকরদাসের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। ডেপুটি শংকর দাস বাড়ীর সামনে দড়ির খাটের উপর বসেছিলেন। ডেপুটি শংকর দাস আমাকে দেখে ডেকে বললেন, হে শেখ! গোলাম আহমদকে বলে দেবে, তোমাদের ছেলেরা যখন মসজিদে আসে তখন শোর গোল করতে করতে আসে - যায় আর আমরা কষ্ট পাই। তাকে বলবে, তিনি যেন নিষেধ করে দেন, ছেলেরা আসতে যেতে যেন শোর গোল না করে। আমি হযরত সাহেবের (আঃ) খেদমতে তেমনই বলে দিলাম। হযরত সাহেব বললেন, "এ বাড়ীটা আমাদের দখলে এসে যাবে। আল্লাহ্ এ বাড়ীর ব্যাপারে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

জন আলেকজান্ডার ডুই সম্পর্কে তার ধ্বংসের খবর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে

পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে জামাতের বই-পত্রে অনেক কিছু প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে আমেরিকায় বসবাস করত। সে 'যিয়ন' নামে একটি শহর আবাদ করেছিল। সে নিজের সম্পর্কে দাবী ঘোষণা করেছিল যে, সে হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের শুভ সংকেত হিসাবে এলিয় হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯০২ইং সনে সে প্রচার করেছিল যে, যদি মুসলমানরা সবাই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ না করে তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৯০৩ইং সে প্রকাশ করল, "মানব জাতির বড় কলঙ্ক ইসলাম (মুসলমানদের)-কে যিয়ন ধ্বংস করে দিবে।"

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৯০৩ইং সনে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করলেন। শিরোনাম ছিল ঃ **ডুই ও পিগট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী**। এখানে হযরত সাহেব লিখলেন ঃ "আমেরিকার জন্য আল্লাহ্তাআলা আমাকে নিদর্শন দিয়েছেন। ডুই যদি আমার সাথে মুবাহালা করে (বদ-দোয়ার প্রতিযোগিতা) এবং আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে অথবা আকারে ইঙ্গিতে নেমে আসে তাহলে সে আমার চোখের সামনে দেখতে দেখতে, বড় আক্ষেপ পরিতাপ ও দুঃখের সাথে এ জগৎ ত্যাগ করে যাবে।"

জবাবস্বরূপ ডুই বলেছিল, "তোমরা কি মনে কর যে, আমি এসব পোকা-মাকড়ের কথার জবাব দিব? আমি যদি আমার পা এদের উপর রাখি, তো এক মুহূর্তে পিষে ফেলতে পারি।"

তারপর দেখেছেন কী হয়েছে? অবশেষে আল্লাহ্র গযবের শিকার হোল। তার উপর পক্ষান্তরে আক্রমণ হোল। তার স্ত্রী ও সন্তানরা তার অসৎ চরিত্রের সম্পর্কে সাক্ষাৎ দিল। তার মুরীদানরা তার প্রতি মন্দ ধারণা করল (ছেড়ে দিল তাকে)। মার্চ ১৯০৭ইং তারিখে ডুই অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে মারা গেল।

তার মৃত্যুর খবর দিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় লিখল "মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জয়যুক্ত হয়েছেন এবং ডুই হেরে গেছেন।"

কোরিয়ার অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খবর পেয়েছিলেন। ১৯০৪ইং সনে যখন রাশিয়া ও জাপানের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর উপর ইলহাম হয়েছিল, "একটি প্রাচ্যের শক্তি ও কোরিয়ার শোচনীয় অবস্থা"। হযরত (আঃ)-এ ইলহাম অনুসারে জাপান জয় লাভ করেছিল। রাশিয়া কোরিয়ার পক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেই থেকে এখনও কোরিয়ার অবস্থা খুব ভাল হয় নি।

জামাতের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির খবর ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

"বারাহীনে আহমদীয়া কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণীও আছে, আমি আমার চমক দেখাব। নিজ শক্তি দর্শন করতঃ তোমাকে উপরে উঠাব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং বড় প্রবল আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করবেন।" এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর প্রায় ৫০ বছর কেটে গেছে। এ সেই যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন কিছুই ছিল না, এ ভবিষ্যদ্বাণীর সারাংশ এই যে, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের কঠোর বিরোধিতার ফলে বাহ্যিকভাবে কোন আশাই ছিল না যে, এ জামাত কায়েম হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর প্রবল আক্রমণসমূহ পৃথিবীকে (মানবমন্ডলীকে) এদিকে টেনে নিয়ে আসবেন। আমার সত্যতা প্রমাণের জন্য বড় বড় আক্রমণ করবেন।

সেসব বড় বড় আক্রমণের মধ্যে প্লেগও একটি। এ সম্পর্কে যথেষ্ট সময় আগেই খবর দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া বড় বড় ভূমিকম্পও সে আক্রমণের মাঝে শামিল যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে হচ্ছে। আল্লাহ্ জানেন আরো কী কী আক্রমণ রচিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্তাআলা একান্তই নিজ শক্তির বিকাশের মাধ্যমে এ জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। নতুবা এত বড় বড় বিরোধ ও আক্রমণের মাঝে কয়েক লক্ষ মানুষকে আল্লাহ্ আমার সঙ্গী করে দিয়েছেন- এটা তো অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বিরোধীরা বড় বড় প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তারা কোনই সাফল্য লাভ করতে পারে নি।"

"আল্লাহ্ আমাকে যা কিছু বলেছেন তা-ও এই যে, দুনিয়ার মানুষ যদি অসৎ কর্ম থেকে বিরত না হয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত না হয় তাহলে পৃথিবীর মানুষের উপর বড় বড় আপদ আসবে। এক বিপদ শেষ হয়ে যাবার আগে অপর একটি এসে উপস্থিত হবে। অবশেষে মানুষ বড়ই সংকটাপন্ন হয়ে যাবে নিরুপায় হয়ে যাবে। এসব কী হতে যাচ্ছে? অনেকেই বিপদে পড়ে পাগলের মত হয়ে যাবে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ প্রভুর দরবারে আরয করেছেন ঃ "হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে মেনেছি। অতএব তুমিও আমাকে কবুল কর। আমার অন্তরের অবস্থাকে দেখ। আমার নিকটবর্তী হও। তুমি তো রহস্য জান। তুমি সে সব বিষয় অবগত আছ যা অন্য মানুষ থেকে গোপন করে রাখা হয়। হে আমার প্রভু! তুমি যদি জান যে, আমার শত্রুরা সত্যের উপরে আছে, তারা তোমার সাথে খাঁটি সম্পর্ক রাখে, তাহলে তুমি আমাকে এভাবে ধ্বংস করে ফেল যেভাবে মিথ্যাদাবীদারদেরকে ধ্বংস করা হয়। আর তুমি যদি জান যে, আমি তোমার থেকে, তোমার তরফ থেকে প্রেরিত তাহলে তুমি আমাকে সাহায্য কর তুমি আমার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী ভিখারী।'

অবশেষে আমি ইংল্যান্ড অন্তর থেকে জামাতের এবং এখানকার নিবেদিতপ্রাণ বন্ধুদের অসাধারণ খেদমতের শুকরিয়া আদায় করছি। প্রিয় এই জামাতের সদস্যরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ইন্তেকালের সময় অসাধারণ খেদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্তাআলা আপনাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমি যতদূর জানি হুযূর (রাহেঃ) ও আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। আপনারা হযরত রাবে' (রাহেঃ)-এর ইন্তেকালের পর সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এত সংখ্যায় মেহমান এসেছিলেন। আপনার অতি উত্তমভাবে খেদমত করেছেন। এটি সামান্য ব্যাপার নয়। অনেক বড় কাজ করেছেন। এই জামাতের খেদমতের দৃশ্য দেখে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। যাই হোক, যখন উদ্দেশ্য সৎ হয় তখন আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন লাভ হয়। প্রত্যেক কর্মী আল্লাহ্র ফযলের ও সমর্থনের নিদর্শনও দেখেছেন।

অনেক বেশি বেশি চিঠিপত্রে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে আমি যেন তাদের পক্ষ থেকে আপনাদের শোকরিয়া আদায় করি। এমন একটি সময়ে পৃথিবীর কোটি কোটি আহমদী এম.টি.এ-এর কার্যক্রম দেখে খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। তারা এমটিএ এর মাধ্যমে নিজেদের অন্তরকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছে। কেউ অতৃপ্ত থাকে নি। সবাই এমটিএ-এর মাধ্যমে অন্তরের পিপাসা দূর করতে পেরেছেন। আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে অনেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছে। অতি সামান্যই বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছেন। এরা সবাই আমাদের দোয়া পাওয়ার দাবী রাখেন। যারা যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছে সকলের জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ্ সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আগামীতেও সবাই যেন এভাবেই আন্তরিকতার সাথে খেদমত করে যেতে পারেন, আমীন।

(ভিডিও রেকর্ডিং থেকে সরাসরি অনুবাদ)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মজলিসে শূরার ভিত্তি হলো তাকওয়া

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ২রা এপ্রিল, ১৯৯৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

২-৪-৯৩ ইং তারিখে রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরা উপলক্ষ্যে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) উক্ত তারিখে খুতবা জুমুআতে বলেন ঃ

মজলিস শূরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নেযাম। এমন বলা ভুল হবে না যে, নেযামে খিলাফতের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেযাম হচ্ছে নেযামে মজলিসে শূরা এবং **মজলিসে শূরার নেযামের সাথে আমাদের জামাতের জীবন সংযুক্ত-সম্পৃক্ত। সম্মিলিতভাবে খিলাফত এবং মজলিসে শূরার মাঝে আমাদের জীবন নিহিত। আর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জীবন যেমন খিলাফত ও শূরার মাঝে নিহিত ঠিক তেমনই খিলাফত ও শূরার জীবন তাকওয়ার মাঝে নিহিত।** কারণ তাকওয়া ব্যতীত খিলাফত অর্থহীন এবং অবাস্তব। অনুরূপভাবে মজলিসে শূরার সদস্যগণ এবং বিশ্বব্যাপী জামাতের সকলেই এ কথা দু'টিকে যদি সামনে রাখেন, তবে আল্লাহ্‌র রহমতে কোন দিন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মৃত্যু ঘটতে পারে না। আমি এ কথা বলি নি যে, খলীফায়ে ওয়াক্‌তের সাথে আহমদীয়তের জীবন বা প্রাণ নিহিত- আমি বলছি খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে জামাতে আহমদীয়ার জীবন বা প্রাণ সম্পৃক্ত বা নিহিত এবং অনুরূপভাবে মজলিসে শূরার নেযামের মাঝে আহমদীয়তের জীবন- শূরার সদস্যগণের সঙ্গে নয়। বিষয় দু'টিকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরে নিবেন। মজলিসে শূরার সদস্য পদের যদিও পবিত্রতা রয়েছে, কিন্তু এ পবিত্রতার একটা সরাসরি সম্পর্ক জামাতের তাকওয়ার সাথে রয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্‌তের (যুগ-খলীফার) ব্যক্তি-তাকওয়ারও একটা বিষয় রয়েছে এবং যে জামাত খলীফায়ে ওয়াক্‌তের নির্বাচন করে সে জামাতের তাক্‌ওয়ারও একটা গভীর সম্পর্ক খলীফায়ে ওয়াক্‌তের ব্যক্তিগত তাকওয়ার সাথে রয়েছে। যেমন দেখা যাচ্ছে যে, কুরআন

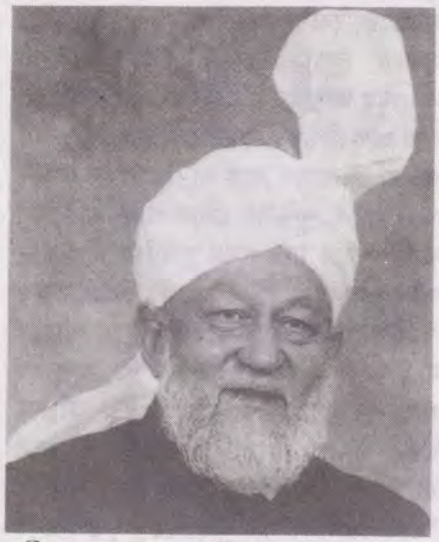

শরীফে আমাদের নসীহত করা হয়েছে ঃ **ওয়াজআলনা লিলমুত্তাকীনা ইমামা** অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।' কারণ গয়ের মুত্তাকীদের ইমাম যদি মুত্তাকীও হন তবুও তিনি প্রাণ শূন্য হবেন। মেধা এবং আত্মা যে শরীর দিয়ে কার্য পরিচালনা করবে সে শরীরে তো শক্তি-সামর্থ্য থাকতে হবে। শরীরেও সামর্থ্য থাকতে হবে কারণ শরীরের শক্তি মেধা এবং আত্মার উপর প্রভাব ফেলে। যদি জামাত তাকওয়াশূন্য হয় তবে খলীফা একা ব্যক্তিগতভাবে সুদীর্ঘ কাল তাকওয়ার উপর চলতে পারে না। কারণ যখন গয়ের মুত্তাকীদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হয় তখন নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যায়। জামাত মুত্তাকী নয়, এমতাবস্থায় খিলাফতের তাকওয়াকে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। এককভাবে কিছু কাল পর্যন্ত 'তাকওয়া'কে ধরে রাখা যেতে পারে- (অনন্তকাল নয়)। কেননা, খিলাফত কোন এক ব্যক্তির নাম নয়-খিলাফত একটি নেযাম। সুতরাং আমি যখন বলছি যে, একতরফাভাবে খিলাফতের দ্বারা 'তাকওয়া'কে ধরে রাখা সম্ভব নয়, তখন এর অর্থ এই যে, খলীফা যদি মুত্তাকীও হয়ে থাকেন, তবুও যে জামাতী নেযাম 'তাকওয়া'র প্রতিচ্ছবি সে নেযাম হচ্ছে নেযামে খিলাফত। এটা যদি ঘোলাটে হয়ে যায় তবে জামাতের ওপর এর ফল সার্বিকভাবে খুব খারাপ হবে। মজলিসে শূরারও সেই একই অবস্থা।

বিষয়টিকে খুব স্পষ্ট করে আপনাদের নিকট তুলে ধরার জন্য যে কুরআনী আয়াতের সাহায্যে নিয়েছি তা হচ্ছে- **ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহে আতক্বাকুম** (নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র নিকট সে-ই বেশি সম্মানের অধিকারী যে ব্যক্তি বেশি তাকওয়াশীল- হুজুরাত ঃ ১৪)। সদস্য পদেরও একটা সম্মান রয়েছে। কিন্তু কুরআন শরীফ সম্মান বা ইজ্জতের যে দৃষ্টিকোণ কায়েম করেছে তা এই যে, সম্মানকে সদস্যপদের মাঝে না রেখে তাক্‌ওয়ার মাঝে রেখেছে। অর্থাৎ **সদস্যপদ ততক্ষণ সম্মানের কারণ যতক্ষণ এ তাওকয়ার জ্যোতিতে পূর্ণ থাকে। সদস্যপদ যদি তাকওয়াশূন্য হয়ে যায় তবে ইহা আর সম্মানের কারণ থাকে না।** আল্লাহ্ বলেছেন, সম্মান বা ইজ্জতের মাপকাঠি তোমাদের নিকট যা-ই হোক না কেন আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সবচেয়ে বেশি সম্মানীত যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী। এখানে আরো একটি কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা কোন পদমর্যাদা রাখেন না তারাও ক্ষতিগ্রস্ত নন। পদমর্যাদার কারণে বেশি খেদমতের সুযোগ ঘটে বটে, কিন্তু **আল্লাহ্‌র দরবারে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য কোন পদবী বা পদমর্যাদা আবশ্যক নয়- তাকওয়া আবশ্যক।** সুতরাং সদস্যপদ বা পদমর্যাদা তাকওয়াশূন্য হলে তা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের যোগ্য নয়। এমন ব্যক্তিবর্গ যারা কোন পদবী ছাড়াই তাকওয়াশীল তারা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত স্থান লাভ করেন। এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এটা না বুঝার কারণে আমাদের নির্বাচনী কর্মকান্ডে ফাটল থেকে যায়। যখন আমাদের শূরার সদস্য নির্বাচন বা অন্য কোন সদস্যপদ (ওহ্‌দাদার) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন চিরন্তন সত্য বিষয়টির উপর দৃষ্টি না

রাখলে এর কুপ্রভাব নির্বাচনের ওপর অবশ্যই পড়ে এবং নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, এটা জরুরী নয় যে, এমন নির্বাচনের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হন তারা অবশ্যই মুত্তাকী হবেন। এমন হওয়া জরুরী নয়। অনেক সময় জামাতে এমন একজন মুত্তাকী ব্যক্তিও থাকেন যিনি বিশেষভাবে জামাতী কর্মকান্ডের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তিনি নির্বাচনেও নির্বাচিত হতে থাকেন। বিভিন্ন কারণে এমন হতে পারে। তবে নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকা অত্যন্ত মারাত্মক। **অর্থাৎ নির্বাচনের সময় 'তাকওয়া'র প্রতি লক্ষ্য না রেখে অন্যান্য জাগতিক প্রভাব, প্রতিপত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা বড়ই মারাত্মক।**

এ সম্পর্কে আমি আপনাদিগকে যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, যদি আপনার পসন্দ আল্লাহ্‌র পসন্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে আপনার পসন্দ উত্তম। এর ফল সর্বদা উত্তম হবে। আপনার পসন্দ যদি আল্লাহ্‌র পসন্দ থেকে ভিন্নতর হয়ে যায় এবং এ দুইয়ের মাঝে ব্যবধান থেকে যায় তাহলে আপনার পসন্দের কোন মূল্য থাকবে না। আল্লাহ্‌র তাঁর পসন্দ বলে দিয়েছেন ঃ "আল্লাহ্ নিকট সে-ই বেশি সম্মানিত যে বেশি মুত্তাকী"। অতএব আল্লাহ্‌র পসন্দ হচ্ছে তাকওয়ায়। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তো তিনি সম্মানিত যিনি তাকওয়াশীল। তোমাদের নিকট সম্মানিত হবার মাপকাঠি বদলে গেলে তোমাদের মাপকাঠির বিকৃতি ঘটেছে-সেখানে তাকওয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। **সুতরাং জামাতের দৃষ্টিতে নির্বাচনের সময় তাকওয়াশীল ব্যক্তি সম্মানিত বলে মনে হলে এ জামাত এমন যে, কোন দিন মরতে পারে না। আর যদি নির্বাচনের সময় মুত্তাকীগণকে সম্মানিত বলে গণ্য করা না হয় এবং নিজ গোষ্ঠীর প্রধানকে সম্মানিত বলে ধরে নেয়া হয়, কোন বিশেষ গোত্রের ব্যক্তিকে সম্মানিত বলে মনে করা হয়; বা কোন বড় জমিদারকে বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে, বা কোন ধনবান ব্যক্তিকে সম্মানিত বলে ধরে নেয়া হয়, তবে এমন নির্বাচন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্বাচন বলে গণ্য হবে না।** খিলাফতের পূর্বে নবুওয়তকে অনিবার্য বা একান্ত জরুরী করা হয়েছে। নবুওয়ত এমনই একটি পদমর্যাদা যা সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্থাপিত করা হয়। এ পদমর্যাদায় এমন এক ব্যক্তিকে ভূষিত করা হয় যিনি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত এবং মুত্তাকী। সুতরাং নেযাম বিবর্জিত মানব সমাজে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিকে মনোনীত না করা হলে নির্বাচনী কর্মকান্ডে তাকওয়া প্রবিষ্ট হয় না বা প্রবেশ করে না। এ এমন একটি সত্য যাকে পৃথিবীর কোন শক্তি পরিবর্তন করতে পারে না। **সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যদি আজ সমস্ত শক্তিও ব্যয় করে তবুও 'খলীফা' নির্বাচিত করে দেখাতে পারবে না। কারণ খিলাফতের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র পসন্দের সাথে সংযুক্ত এবং আল্লাহ্ স্বয়ং আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন সেই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে 'তাকওয়াশীল'।** অতঃপর মুত্তাকীদের একটি দলকে সে ব্যক্তি নিজ আয়ত্তে একত্র করে নেয়। যেমন দুধের মাঝে এক ফোঁটা দই সমস্ত দুধের দই হবার জন্য সাজস্বরূপ হয়ে থাকে, তেমনই আল্লাহ্‌র নবীর তাকওয়া থেকে তাকওয়া লাভ করে একটি তাকওয়াশীল বড় জামাত গড়ে উঠে-এ জামাতের নির্বাচনকে আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলা হয়। নির্বাচনকারীরা মুত্তাকী না হলে তাদের নির্বাচনকে আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলা যায় না। সুতরাং আহমদীয়া মুসলিম জামাত যখন দাবী করে যে, খলীফা আল্লাহ্ নির্বাচন করে থাকে তখন এ অর্থে আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলে দাবী করে।

অতএব খিলাফতের সাথে সেই জামাতের তাকওয়ার বড় গভীর সম্পর্ক যদি সে জামাত মুত্তাকীনের জামাত হয় এবং তাদের নির্বাচন আল্লাহ্‌র নির্বাচন বলে গণ্য করা হবে। এমন জামাতের দৃষ্টি সর্বদা তাকওয়ার ওপর পড়রে এবং তাদের নিকট সম্মানের মাপকাঠি তাকওয়া হবে। এবং এ বিধান বা নীতি খিলাফত থেকে পর্যায়ক্রমে নীচে নেমে ধাপে ধাপে পদমর্যাদা (সদস্যপদ)-সমূহের ওপর প্রযোজ্য হবে যাদের নির্বাচন হয়ে থাকে।

এখন মজলিসে শূরার প্রতিনিধিগণের নির্বাচন যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে হয় তবে সেই প্রতিনিধিগণ যারা মজলিসে শূরায় জামাতের (আহমদীয়া) প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের দৃষ্টি কোন দলগত বা গোত্রগত স্বার্থের ওপর পড়বে না, কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ব্যক্তিগতবিরোধিতার ওপরও পড়বে না। তাঁদের মতামত বা ফয়সালা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হবে। তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। তারা একথা চিন্তা করবেন যে, আমাদের প্রিয় খোদা যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন এবং এর নাম 'তাকওয়া'। **যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের চিন্তায় জীবন যাপন করেন তিনি মুত্তাকী। এবং তিনি সর্বক্ষণ একথা চিন্তা করতে থাকেন যে, আমার আল্লাহ্ যেন সন্তুষ্ট হয়ে যান-আমার আল্লাহ্ যেন অসন্তুষ্ট হয়ে না যান।** কারণ এটাই তাকওয়ার প্রাণ। এ মনোভাবে নিয়ে যারা পরামর্শের জন্য একত্র হন তাদের অন্তর থেকে কাউকে কষ্ট দেয়ার কল্পনা, চালাকীতে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের কল্পনা, জোরালো বক্তব্য উপস্থাপনের কল্পনা, অন্যের যুক্তিকে খন্ডনের চিন্তা, নিজ গৌরবের কল্পনা, বেশি ভোট লাভের চিন্তা ইত্যাদি সমস্তই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমন মজলিস যা প্রকৃতপক্ষে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মজলিস হয়, যেখানে সবাই একত্র হন কেউ বিজয়ী হলে তাতে তার মাঝে কোন পার্থক্য ঘটে না, কেউ জয়ী না হলেও তার মাঝে কোন পার্থক্য ঘটে না। কেউ কোন মতামত ব্যক্ত করে একা হয়ে পড়লে এতে তার মাঝে কোন পার্থক্য ঘটে না যে, কে তার সমর্থন করল বা করল না ... তিনি বিচলিত হন না। তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকেন এবং তিনি মানসিক রোগাক্রান্ত হন না। সুতরাং মানুষের মানসিক ও আন্তরিক বা আত্মিক সুস্থতা রক্ষার জন্য তাকওয়া অতি জরুরী। এ ব্যতীত কোন প্রকার সুস্থতা বাকী থাকে না। অতএব মজলিস শূরার সদস্য নির্বাচনে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের তাকওয়ার ঝলক মজলিসে শূরার মাঝে প্রকাশ পাবে। আর ভুলক্রমে কিছু দুর্বল তাকওয়ার লোকও মজলিসে এসে গেলে তাতে কিছু যায় আসে না। অনেক সময় এমন হতে পারে যে, নির্বাচনকারীরা ভুল না করলেও কিছু কিছু দুর্বল ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে

আসতে পারেন। অনেক সময় অজ্ঞানতার পর্দার আড়াল হতে যেমন এক ব্যক্তিকে তার সঙ্গীদের দৃষ্টিতে মুত্তাকী বলে মনে হয়েছে, অথচ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে মুত্তাকী ছিল না (এমন হতে পারে)। এমন নিশ্চিত বলা যায় না যে, নির্বাচনকারীরা মুত্তাকী হলে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিতগণও অবশ্যই মুত্তাকী হবেন। তবে হ্যাঁ, মুত্তাকীনের সংখ্যা যত বেশি হবে মুত্তাকী ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে। কিন্তু যেহেতু কিছু দুর্বল তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে তাই দোয়া করতে হবে। তাকওয়া একাকী কর্মক্ষম নয়, যে পর্যন্ত না দোয়া শামিল হয়। **অতএব নির্বাচনের পূর্বেও দোয়া করতে হবে। দোয়া করতে হবে যে, হে আল্লাহ্! আমাদের পসন্দ যেন তোমার পসন্দ হয় এবং তোমার পসন্দ যেন আমাদের পসন্দ হয়ে যায়। তোমার পসন্দের ও আমাদের পসন্দের মাঝখানে দূরত্ব যেন না থাকে। আমরা তো সব জ্ঞান রাখি না। তুমি নিজেই বলেছঃ হুয়া আ'লামু বিমানিত্তাকা অর্থাৎ তুমিই একমাত্র জ্ঞান রাখ যে, কে মুত্তাকী। আমরা জানি না। আমরা মুত্তাকীদের নির্বাচনের জন্য একত্র হয়েছি কিন্তু আমরা জানি না তোমার পসন্দ কি (বা কারা)। আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি তুমি আমাদের নির্বাচনকে তোমার নির্বাচন বানিয়ে দিও এবং সঠিক নির্বাচন করেও দিও।**

অতএব মজলিস শূরাকে প্রাণবন্ত বা জীবন্ত করতে চাইলে আপনারা তাকওয়ার হেফাযত করুন। তাকওয়ার হেফাযতের জন্য এর শিকড়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় যেখান থেকে তাকওয়া-বৃক্ষের চারা বর্ধিত হতে থাকে। গোড়ার শিকড় ঠিক থাকলে সবই ঠিক থাকবে, যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"হার এক্ নেকি কি জাড় ইয়ে ইত্তেকা হ্যায়
গার ইয়ে জাড় রাহে তো সব কুচ্ছ রাহা"।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, 'যখন তিনি এ পংক্তিটি লিখছিলেন 'হার এক নেকী কি জাড় ইয়ে ইত্তেকা হায়- অর্থাৎ প্রত্যেক নেকীর বুনিয়াদী শিকড় এ তাকওয়া, তখন যদ্দুর আমার মনে পড়ে পংক্তির দ্বিতীয় ছত্র ইলহাম হ'ল ঃ গার ইয়ে জাড় রাহে তো সব কুচ্ছ রাহা অর্থাৎ ঃ এ ভিত কায়েম থাকলে সব কিছু কায়েম রইল?'

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক পুণ্যের ভিত্তি হচ্ছে তাক্ওয়া। কিন্তু তাক্ওয়াকে সমুন্নত রাখা তোমাদের কর্তব্য। তাওয়ার ভিতকে কায়েম রাখতে পারলে সব কিছুই কায়েম থাকবে। **নেযামে শূরাকে কায়েম রাখতে চাইলে নেযামে খিলাফাতকে কায়েম রাখতে চাইলে তা কেবল তাকওয়া-ভিত্তিক পথে কায়েম রাখা সম্ভব।** আপনারা সকলকে পয়গাম দিবেন কারণ, যা মজলিস শূরাকে বলছি তা সবাইকে বলছি- তোমাদের প্রত্যেক নির্বাচনকে 'গয়রুল্লাহ্' মুক্ত করে দাও; (আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ যেন না থাকে), নিজেদের চৌধুরীপনা (অহংকার)-কে বের করে দাও; নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে বের করে দাও, কেবল মাত্র একটি সম্পর্ক কায়েম রাখ-শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যেন কায়েম থাকে। তাওকয়াকে বজায় রেখে নির্বাচন কর। **আমি তোমাদিগকে শুভ সংবাদ দিচ্ছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত এ জামাত মরতে পারে না, বরং তা অগ্রসর হতে থাকবে, অগ্রসর হতে থাকবে, অগ্রসর হতে থাকবে।**

সুতরাং মজলিস শূরার প্রাণশক্তি তাকওয়ার মাঝে নিহিত। দুর্বলতা যদি থেকে যায় দোয়ার মাধ্যমে তা পূর্ণ হবে। **নিজেদের সকল প্রকার নির্বাচনকে দোয়ার দ্বারা সম্পন্ন** কর। এমন দোয়া কর যে, আমরা আল্লাহ্‌র পসন্দমত নির্বাচন করতে চাই। এমন দোয়ার ফলে চিন্তাধারার মাঝে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। আমার নিজ পসন্দের কোন মূল্য নেই। হে খোদা! তোমার পসন্দই আমাদের পসন্দ। হে খোদা! আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বক্রতা দূর করে দাও-অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টি-শক্তির ওপর কোন আড়াল থাকলে তা দূর করে দাও। তোমার পসন্দের (রেযামন্দি) পথ আমাদিগকে দেখাও। তাকে ভোট দিবার তৌফীক দাও, যে তোমার দৃষ্টিতে মুত্তাকী এবং সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। এরূপ দোয়ার মাঝে জামাত যে নির্বাচন করবে আল্লাহ্ তা পসন্দ করবেন। **প্রত্যেক এমন নির্বাচন যা তাকওয়ার ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে তা আল্লাহ্‌র ফযলে আল্লাহ্‌রই নির্বাচন হবে।**

আর একটি কথা। তাকওয়া কোথায় অবস্থান করে, কীভাবে জীবিত থাকে! **তাকওয়া ইবাদতের মাঝে দিয়ে জীবিত থাকে।** যে জাতি ইবাদতশূন্য হয়ে পড়ে সে জাতি তাকওয়াশূন্য হয়ে পড়ে। নামায সম্পর্কে কুরআন বলেছে, **ইন্নাস্ সলাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার-** নিশ্চয় নামায সকল মন্দ থেকে, সকল গুণাহ থেকে রক্ষা করে। এমন যাবতীয় বিষয় যে সমস্ত বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয় না- এসব বিষয় থেকে মানুষকে নামাযই রক্ষা করে। তাকওয়ার প্রাণকেন্দ্র ইবাদত। আমি সর্বদা নামাযের প্রতি বিশেষ জোর দিতে চেষ্ট করি। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা কি? যতই বেশি চেষ্টা করা হোক এ কথা বলা যায় না যে, বিশেষ হয়েছে- এটা তো একটা কথার কথা।

এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে বহু অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির কথা উল্লেখ করে নামায থেকে বিরতি চাইলে হুযূর (সঃ) বললেন, **নামায নেই তো কিছুই নেই। সুতরাং ইবাদত কোন ক্রমেই বাদ দেয়া যায় না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয় নামাযের জন্য। এ পরিচ্ছন্নতা যদি না-ও সম্ভব হয় তবুও নামায থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়।** সুতরাং ইবাদত কায়েম করুন। (শুধুমাত্র শূরা সংক্রান্ত অংশটুকু পেশ করা হলো)

৩০/৪/৯৩ খুতবা জুমুআর শেষাংশে হুযূর (আইঃ) শূরা সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমি বার বার বলেছি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য খিলাফতের পরে মজলিসে শূরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন শরীফ পড়ে মনে হয় যে, আমাদের নেযামে জামাতের বা দীনি নেযামের প্রাণ এ দু' নেযামের মাঝে নিহিত রয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সকল দেশে মজলিসে শূরার অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করে আসছি এবং তৎসংগে এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করছি এবং বার বার ইসলাহ্ বা সংশোধনের চেষ্টা করছি যেন আগামী শতাব্দীতে কোন ভুল প্রথা থেকে না যায়।

অনেক সময় আমাদের কেউ কেউ বহির্জগতের সংসদ দেখে প্রভাবিত হয়ে ভুল পথের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়। এদের বার বার বুঝানো প্রয়োজন। **মজলিসে শূরার অতি উন্নত নিয়মাবলীর (রেওয়ায়াত) হেফাযত করা আবশ্যক**। আমার বারংবার নসিহতের পরেও আমার অনুপস্থিতিতে কেউ কেউ পশ্চাদপদ হতে উদ্যত হয়। আমার উপস্থিতিতে তার বাচনভঙ্গী এক প্রকার হয়ে থাকে এবং আমার অনুপস্থিতিতে অন্য প্রকার, এটা অতি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি।

বস্তুতঃ মু'মিন সকল সময়েই নিজেকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত ভেবেই জীবন যাপন করে। আল্লাহ্ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বক্ষণই তাকে দেখছেন। **যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এরূপ মনোবৃত্তি পোষণ করে নিজ দায়িত্ব পালন না করবে ততক্ষণ তার অবস্থান তাকওয়ার পোষাক বিবর্জিত অবস্থান হবে। তাকওয়া ব্যতীত আমাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই**। তাকওয়ার কেন্দ্রবিন্দু এই যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নজমের মাঝে বলেছেন, যা আমরা বার বার পড়ে থাকিঃ **ফাসুবহানাল্লাযী মাঁইয়ারানী** অর্থাৎ তিনি পবিত্র খোদা, যিনি আমাকে দেখছেন।

যদি মজলিসে শূরায় অংশ গ্রহণ কালে আপনি স্মরণ করেন যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, আমার ভাব-ভঙ্গীর উপর, আচার ব্যবহারের উপর দৃষ্টি রাখছেন বা যদি বদ আচরণ করি, যদি কারো মনে আঘাত দেই বা পরামর্শ করার সময় আমিত্বকে বজায় রাখি, কিংবা চালাকি ও অন্যের উপর নিজ জ্ঞান-গরীমার প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করি, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, এমন সকল বিষয়কে আল্লাহ্ দেখছেন এবং নিশ্চিত অসন্তুষ্টি চোখেই এটা দেখছেন। আর যদি মানুষের ওপর তার প্রিয় খোদার অসন্তুষ্টির দৃষ্টি পড়ে তবে তো তার অংগ-প্রত্যংগ কেঁপে উঠে। সুতরাং মানুষ তার প্রিয় খোদাতাআলার নিকট সুন্দরভাবে সেজে গুজে যাবে, নিজ দুর্বলতাসমূহের ওপর পর্দা ফেলে তবে যাবে। লজ্জা নিবারণের উপায় করে তবে যাবে।

আল্লাহ্‌র অপূর্ব মহিমা যে, তিনি 'যাহের' এবং 'বাতেন'ও (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য)। তাঁর 'বাতেন' হওয়া মানুষের প্রতি বড় অনুগ্রহ। কারণ আল্লাহ্ আমাদের চোখের ওপর থেকে যখন সরে থাকেন তখন মানুষের কিছু অবকাশ লাভ হয়। কিন্তু এমন বিষয় আছে যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন, নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া বা ঘরেও নামায পড়ার সময়, অথবা কোন বিশেষ মজলিসের সময়, যে মজলিস খোদাকে সামনে বিদ্যমান বিবেচনা করে পরিচালিত হয় এমন সময় আপনারা নিজেকে বিশ্বাসে অবস্থিত মনে করবেন না। বরং এমন সময় খুব আগ্রহের সাথে এবং আল্লাহ্‌র উপস্থিতির কথা কল্পনা করে নিজ আচরণকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করুন। সকল শয়তানী আচরণকে বর্জন করুন।

এমন সময় মানুষের দু'প্রকার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। **প্রথম ব্যবস্থা হচ্ছে ইস্তিগফার করা যদ্বারা নিজ দুর্বলতাসমূহকে গোপন করা সম্ভব**। ..... [আদম (আঃ)-এর ঘটনার দ্বারা উপমা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সামনে এসে পড়লে লজ্জা বোধ হয় এবং লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে হয়।] ..... আল্লাহ্‌র সম্মুখীন অবস্থায় ইস্তিগফারের পর্দা গ্রহণ করা কর্তব্য, রিয়াকারী বা লোক দেখানোর পর্দা নয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এভাবে করা হয় যে, নিজেকে সুসজ্জিত করা গুনাহ্‌কে গোপন করে পুণ্যকে প্রসারতা দেয়া। আল্লাহ্‌কে সামনে রেখে এমন কথা-বার্তা বলবেন যেন আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। দোয়া করা একটা বড় জরুরী কৌশল। এমন দোয়া করুন যা আল্লাহ্‌র পসন্দ হয়।

অতএব সর্বপ্রথম ইস্তিগফার অর্থাৎ নিজ দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। আর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে নিজের 'আমিত্ব'। বার বার আপনাকে আপনার নাফ্‌স ধোঁকা দিবে। অন্যের দুর্বলতা দেখে হাসাহাসি করতে শিক্ষা দিবে। অসংগত যুক্তি-প্রমাণ শুনে তার প্রতি হাসি-তামাশা করার শিক্ষা দেবে। এমন কত প্রকার শয়তানী জল্পনা-কল্পনা হতে পারে, প্ররোচনা থাকতে পারে, যা এমন মজলিসে মানুষের বিবেক বা অন্তরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলে, তা নিজ জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এসব থেকে বাঁচতে হলে ইস্তিগফার করবেন। এরপর এমন দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্‌র কাছে পথ-নির্দেশ চান। চালাকীর দিকে যাবেন না। এমন দোয়া করেন যেন বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়; যেন আল্লাহ্ ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেন। দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার খাতিরে পরামর্শ করতে এসেছি। আমাদিগকে সুন্দরভাবে পরামর্শ উপস্থান করার তৌফীক দাও।

আর সব কিছু করার পর এই ভেবে হাত বেঁধে বসে থাকবেন যে, যা করণীয় ছিল আমরা করেছি। এখন আমাদের পরামর্শ গ্রহণ হোক বা না হোক, এ বিষয়ে আমরা 'সামে'না' ওয়া 'আতা'না' (শুনলাম ও গ্রহণ করলাম) পদ্ধতিতে আমল করব। যা ফয়সালা হবে আমরা মেনে নেব। পরামর্শ দেবার পূর্বেও আমাদের যে আচরণ ছিল পরেও তা-ই থাকবে।

আমি মনে করি যে, এ তিনটি বিষয় মজলিসে শূরার মাঝে বরকত বা কল্যাণ বয়ে আনবার জন্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে মজলিস শূরাকে জীবন্ত রাখার জন্য জরুরী। (১) প্রথমঃ **ইস্তিগ্‌ফার করতে করতে উপস্থিত হবেন**। অতঃপর (২) **নিজের পুণ্যকে উজ্জ্বল করুন** (অর্থাৎ বেশি বেশি দোয়া **করুন) আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হোন**। (৩) **নিজে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হোন**। পরামর্শ দেয়ার পর বসে দোয়া করুন যে, পরামর্শ দিয়েছি- এখন গ্রহণ হোক বা না হোক আমরা সন্তুষ্ট আছি। আমাদের করণীয় যা ছিল করেছি। এমন মনোভাব নিয়ে শূরায় উপস্থিত হবেন।

আমি বিশ্বাস করি যে, মজলিসে শূরা জামাতের সঠিক গুণগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দিবেন যা জামাতের চিরকাল জীবন্ত থাকার নিশ্চয়তা দিবে বা জামাতের জন্য রক্ষাকবচ হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদিগকে তৌফীক দান করুন। (সম্পাদিত ও পুনঃ প্রকাশিত)

অনুবাদ - মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ২ ঃ অধ্যায় ঃ ৪

তাও মতবাদ (Taoism)

নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চীন দেশের সমস্ত ধর্মীয় মতবাদই মূলতঃ চীনের প্রখ্যাত সাধক ও ভাববাদী ফূসীয় (Chinese sage prophet Fu Hsi) আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং একই উৎস থেকে উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে আরো অনেক সাধক ও গবেষক ফূসীয় ধর্মীয় শিক্ষা জানার জন্য তৎপর হন এবং গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সহকারে সেগুলো অধ্যয়ন করেন। সেই সূত্রেই চীনে পরবর্তীকালে বহু দর্শন, জ্ঞান ও কলা-কৌশল এবং নৈতিক শিক্ষা-সম্বলিত অনেক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এসব বিদ্বজ্জনের মাঝে রাজা ওয়ান, তার ছেলে চেউ কুং (Cheu Kung) এবং লাউ জু (Lao Tzu) সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সকল যুগের চীনাদের নিকটই তারা গভীর সম্মানের আসনে সমাসীন। লাউ জু, যার জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে, এবং যিনি কনফূসিয়াসের একজন সম-সাময়িক ছিলেন, তিনি ও মানব জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির ব্যাখ্যা দেন। লাউ জু কর্তৃক পেশকৃত নীতি-আদর্শই বর্তমানে 'তাও' মতবাদ (Taoism) নামে পরিচিত।

তাও মতবাদ অনুসারে শাশ্বত সত্যের উৎস হচ্ছে Tao নামক এক অস্তিত্ব, যার গুণাবলী আধ্যাত্মিক, পবিত্র এবং অ-পার্থিব (Whose attributes are spiritual and holy rather than material)। মূলতঃ ইসলাম এবং অন্যান্য ঐশী ধর্মে খোদার পরিচয় প্রদানে যে গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা Tao এর সমার্থক। এ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মানুষকে পরিপূর্ণভাবে চিরায়ত সত্য বা Tao এর নিকট আত্ম-সমর্পণ করতে হবে (Completely submit to Tao) এবং তার গুণাবলী অর্জন ও তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সেদিক থেকে Tao হচ্ছে আদর্শ বা Model এবং Tao -এর নীতিমালা হচ্ছে সেই আদর্শের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভের পথ বা উপায় (Tao is

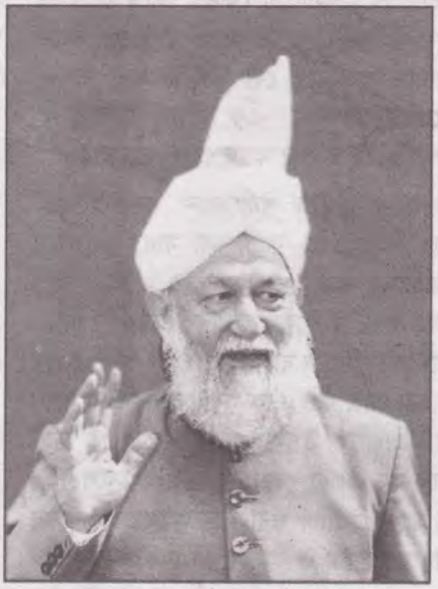

the model, and Taoism is the way to gain nearness to this model)।

আমরা জানি, খোদা এবং মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে হুবহু একই মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ঃ

"আল্লাহ্‌র ধর্মকে (তার বৈশিষ্ট্য সহকারে) আমরা গ্রহণ করেছি। (আর এ ধর্ম মানুষকে জানানোর ব্যাপারে) আল্লাহ্ হতে উত্তম অন্য কে হতে পারে? এবং আমরা তারই ইবাদতকারী" (বাকারা ঃ ১৩৯)।

পবিত্র ইসলামের শিক্ষানুসারে খোদাকে তাঁর গুণাবলী বা সিফতের মাধ্যমে জানতে হয় এবং প্রতিটি মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যও তাই খোদার সিফত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং নিজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো। Lao tzu কর্তৃক বর্ণিত Tao-এর যে পরিচিতি আমরা পাই, তা কুরআনে বর্ণিত একই খোদার মৌলিক রূপকে তুলে ধরে। যেমন ঃ

"মহান Tao এর অস্তিত্ব হচ্ছে বিশাল। তিনি যেমন ডানদিকে আছেন, তেমনি বাম দিকেও আছেন। সমস্ত সৃষ্টি তার উপর নির্ভরশীল এবং এ সকলের দেখা-শুনা তাকে ক্লান্ত করে না। কোন বিনিময়ের দিকে না তাকিয়েই তিনি সৃষ্টিকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে আসেন। তার সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজন তিনি মিটিয়ে থাকেন, কিন্তু তার কিছু দরকার নেই। এ দিক থেকে আমরা তাকে সূক্ষ্ম হিসাবে কল্পনা করতে পারি। অন্যদিকে সকল জীব তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার মুখাপেক্ষী, অথচ তিনি নিজ প্রয়োজন পূরণে কারো মুখাপেক্ষী নন। এজন্য তাকে আমরা মহান (The Supreme) বলে অভিহিত করতে পারি। নিজের মহত্বের জন্য তার কোন বড়াই নেই, এবং মূলতঃ এজন্যই তিনিই প্রকৃত মহৎ।" অন্য একটি বর্ণনায় Tao সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"তাকে অনুসন্ধান করা হয় (Looked for) কিন্তু দেখা যায় না। এ ধরনের অস্তিত্ব তাই বর্ণহীন (colourless)। শোনার চেষ্টা করা হয় (Listened for), কিন্তু শোনা যায় না, তাই সেই অস্তিত্ব হচ্ছে নীরব (Silent)। আঁকড়িয়ে ধরার চেষ্টা করা হয় (grasped for), কিন্তু ধরা যায় না, সেই অস্তিত্বকে আমরা বলতে পারি গুপ্ত (concoated)। এ তিন বৈশিষ্ট্যের উৎস সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি কেউ করতে পারে না, কিন্তু একের ভিতরে এ তিন অস্তিত্ব পরিণতি লাভ করেছে। দীপ্তিমান এ অস্তিত্ব যেহেতু অনন্ত, তাই বর্ণনার অতীত। তার রূপ সম্পর্কে সঠিক বর্ণনায় সমস্ত আকৃতিই যেহেতু অকিঞ্চিৎকর, আমরা তাই তাকে নিরাকার (Shapeless) বলতে পারি। তার প্রতিমূর্তির কোন নির্দিষ্ট ছাচ (from) নেই, তাই তাকে চেতনায় আনা যায় না (beyond comprehension)। তার শুরুর নাগাল ধরতে চাও, পৌছাতে পারবে না, এর শেষ কোথায় জানতে চাও, উপলব্ধি করতে পারবে না। তাই, প্রাচীন বা অতীতের এ শিক্ষার অনসুরণ কর, আর তোমার বর্তমানকে উন্নত কর।"

অন্য একটি স্তবকে Tao সম্পর্কে নীচের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ঃ

"তিনি অদৃশ্য এবং তার সঠিক প্রকৃতি মানবীয় উপলব্ধির উর্ধ্বে। সমস্ত সৃষ্টি তার থেকে উদ্ভব হয়েছে। এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই তিনি বিরাজমান ছিলেন। আকৃতি বা শব্দের বাইরে এক ও একক (alone) অস্তিত্ব তিনি। কোন অবলম্বন বা সাহায্যকারী ছাড়াই তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিরাজ করেন। তার

অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি সর্বদা গতিশীল (Motion), কিন্তু কখনো ক্লান্ত হন না। তাকে বিশ্বজগতের জনক (begetter of the universe) হিসাবে অভিহিত করা যায়।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিমূলে Tao-এর যে পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে, তা বস্তুতঃ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত খোদাতাআলার ধারণা বা ভাবমূর্তি বিশেষ। আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-ও তাঁর বিভিন্ন লিখায় খোদাতাআলার বিভিন্ন গুণকে এভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ "তিনি নিকটে থেকেও দূরে, বহু দূরে থেকেও কাছে ...। তিনি উচ্চতমের মধ্যেও সবচেয়ে উঁচুতে, কিন্তু একথা বলা যাবে না, যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁর নীচে আছে। তিনি স্বর্গে আছেন, কিন্তু একথা বলা যাবে না যে তিনি পৃথিবীতে নেই। তিনি তাঁর মাঝে সবচেয়ে উত্তম ও পরিপূর্ণ গুণাবলীর সংযোগ ঘটিয়েছেন, এবং এমন উন্নত গুণের বিকাশ ঘটান যা তাঁকে সকল প্রশংসার যোগ্য দাবীদার হিসাবে, প্রতিপন্ন করে।"

প্রসংগত উল্লেখ্য, সমস্ত চীনদেশীয় দর্শন আজকের পৃথিবীতে পরিচিত, তার মাঝে বেশির ভাগ দর্শনের মূল কিন্তু ধর্ম ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু সময়ের বিবর্তনে ধর্মের মূলের সাথে তাদের সমন্বয় অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। কেননা এসবের অনুসারীরা মূলত দর্শনের বাহ্যিক দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে এবং অতীতে যে উৎসের ওগুলো সম্পর্কিত ছিল, তার অনুসন্ধানকে তারা অনেকটা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করেছে। কালক্রমে খোদাতাআলার যে পরিচিতি তা অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়ে, এবং Tao মতবাদের অনুসারীরা খোদার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অর্জন ও প্রসারের চেষ্টাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। খোদা যে চিরন্তন, শাশ্বত, সচেতন মঙ্গলময় এক মহান অস্তিত্ব এ উপলব্ধিটিই তাদের কাছে গৌণ হয়ে যায়।

সংক্ষেপে যতটুকু পর্যালোচনা করা হয়েছে-তার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায়, কলফুসীয় মতবাদের মত Tao মতবাদও আদিতে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাই কনফুসিয়াস বা Tao-এর মূল শিক্ষা ছেড়ে আমরা আজ যদি একে শুধু একটি নিছক দর্শন বা বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি হিসাবে চালাতে চাই, তবে বড় একটা ভুল করা হবে। আসলে Tao বা মহান ঐশ্বরিক গুণাবলীর আলোকে একজন মানুষের চরিত্র ও কর্মকান্ডের বিকাশ ঘটানোই হচ্ছে Tao মতবাদ অনুযায়ী মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

যাই হোক, কালের বিবর্তনে এক স্রষ্টার বিশ্বাসে কিছুটা অস্পষ্টতা সত্ত্বেও Tao মতবাদ অনুযায়ী অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা হিসাবে ঐশীবাণীর এক প্রকার ধারণা (Ideal of revealation) এখানো তাদের মাঝে বিদ্যমান। তবে, এটা এক ধরনের ইন্দ্রিয়গত অভ্যন্তরীণ ঘটনা বিশেষ, যা গভীর মনোযোগ, বা নিষ্ঠা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে সত্যের উৎসমুখে নিয়ে যায় বলে তাদের ধারণা। ঐশী উৎস অর্থাৎ খোদার অস্তিত্বে অস্বীকারজনিত অস্বাভাবিক বিচ্যুতির ফলেই এ ভাবনাকে তারা লালন করছে, কেননা বিশ্বস্ত Tao-এর শিক্ষা মতে (as quoted in the authentic Taoist works) এ অনুপ্রেরণা কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল হিসাবে জন্ম নেয় না। বরং, ঐশী প্রভাবেই ঘটে থাকে।

আমরা প্রথমেই বর্ণনা করেছি যে, Tao মতবাদের বুনিয়াদী স্তম্ভ হচ্ছে Fu Hsi কর্তৃক দেখা ঐশ্বরীক দর্শন বা দিব্য-দর্শন। অনুপ্রেরণা বা Inspiration-কে যতই টেনে বাড়ানো হোক্ না কেন, তা কিছুতেই সেই দিব্য-দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। বলা হয়, Fu Hsi -এর শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে চীনদেশে বহু দর্শন ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যে শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু জটিল ক্ষেত্র উন্মোচন করে দিয়েছে, তার ভিত্তি শুধু অনুপ্রেরণা কি করেই বা হয়?

সুতরাং এই প্রসঙ্গে এখন আমরা বুদ্ধিসম্মত ভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে অনুপ্রেরণার ফলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কোন অতিপ্রাকৃত সত্তার স্বীকৃতি বা তার থেকে প্রদত্ত কোন ঐশীবাদী ছাড়া ভবিষ্যতের কোন ঘটনার বিবরণ দেয়া বা ভবিষ্যতের জগত বা জীবন সম্পর্কে সত্য উদঘাটন করা কখনো সম্ভব হয় না। (চলবে)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

শূরার প্রতিনিধিবৃন্দের জন্যে কতিপয় বিশেষ দিক-নির্দেশনা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)

শূরার অবস্থান ঃ

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার যুগ-খলীফারই, অন্যান্যদের কাজ পরামর্শ দান করা। মজলিসে শূরা কোন সিদ্ধান্ত নেয় না বরং পরামর্শ দিয়ে থাকে। সিদ্ধান্ত খলীফা নিয়ে থাকেন। এটা বলাও উচিত নয় বা লেখাও উচিত নয় যে, মজলিস এ সিদ্ধান্ত করেছে। বরং এটা বলা উচিত যে, মজলিস এ পরামর্শ দিয়েছে বা মজলিসের পরামর্শক্রমে খলীফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন (রিপোর্ট মজলিসে মোশাবেরাত ১৯২৮ পৃঃ ৪৭)।

শূরার অধিবেশনে অনুপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

যেসব সদস্য বিনা অনুমতিতে শূরার অধিবেশনে উপস্থিত হয় না তাদেরকে ভবিষ্যতে শূরার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হোক *(রিপোর্ট মোশাবেরাত ঃ ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ৩৪)।*

শূরার প্রতিনিধিদের জন্যে পথ-নির্দেশনা ঃ

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি যেন খোদার প্রতি ধ্যান নিমগ্ন করে আর দোয়া করে, হে আল্লাহ্! তোমার জন্যেই এসেছি, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নাও। কোন ব্যাপারে আমার দৃষ্টি যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি না পড়ে আর এমন না হয় যে, কোন ভুল মতামত ব্যক্ত করি এবং এর ওপরে চাপ প্রয়োগ করি যে, (আমার কথা) মান্য করা হোক, আর ধর্মের ক্ষতি হয়। এমন না হয় যে, আমার মাঝে অহং ভাব এসে যায় বা নিজের গৌরব ও সম্মান বা আত্মম্ভরিতাভাব এসে যায় আর না আমি কোন ত্রুটিপূর্ণ মতামতের সমর্থন করে বসি। আমার নিয়্যত ও মতামত যেন যথার্থ হয় এবং তোমার ইচ্ছানুযায়ী সাধিত হয়।

(২) পরামর্শের সময় ব্যক্তিগত কথা-বার্তা যেন অন্তর থেকে বহির্গত হয়ে যায়। পরামর্শের অর্থই হলো নিজের মস্তিষ্ককে পরিচ্ছন্ন ও শূন্য

করে বসা। সাধারণতঃ লোকেরা সিদ্ধান্ত করে বসে যে, এ কথা মানতেই হবে আর এর ওপরে জিদ করতে থাকে। কিন্তু আমাদের জামাতকে সঠিক কথা মানা উচিত ও মান্য করানো উচিত।

(৩) কারও খাতিরে মতামতকে চেপে যাওয়া উচিত নয় এবং যে মতামত সঠিক মনে করো উপস্থাপন করে দাও।

(৪) অন্য কোন কৌশলের মাধ্যমে মতামত দেয়া উচিত নয় বরং এটা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, যে প্রস্তাব হয়েছে এর জন্যে কোন্ কথা কল্যাণপ্রদ।

(৫) যে কথা সত্য তা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়, হোক না তা অন্য কেউ উপস্থাপন করেছে।

(৬) কোন মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। লোকদের কথা শুনো, ওগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করো এবং পরে মতামত প্রদান করো।

(৭) কখনও মনে একথা স্থান দিও না যে, আমাদের মতামত সুদৃঢ় ও ত্রুটিমুক্ত। কতক লোক এতে হোঁচট খায় আর বলে, আমাদের মতামত ভুল হতেই পারে না। সত্য ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ কথাকে স্বীকার কর এবং মূর্খতাপূর্ণ কথা-বার্তা মান্য করো না।

(৮) এ কথার পক্ষে মতামত প্রদান করা উচিত যার মাঝে ধর্মীয় কল্যাণ অনেক বেশি।

(৯) আমাদের প্রস্তাবসমূহ যাদের মোকাবেলায় আমরা দাঁড়িয়েছি তাদের প্রস্তাবগুলোর চেয়ে উত্তম ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হোক।

(১০) মতামত দেবার পূর্বে দেখে নাও, যে কথা উপস্থাপিত হয়েছে তা আসলেই কল্যাণপ্রদ বা ক্ষতিকারক। শাখা-প্রশাখাকে দেখবে না বরং মূলের প্রতি দৃষ্টি দাও।

(১১) কোন বিশেষ কথা ব্যতিরেকে এমনিতেই পুনরাবৃত্তির জন্যে দাঁড়িও না। অবশ্য, যদি নতুন প্রস্তাব থাকে তাহলে উপস্থাপন করো *(মজলিসে মোশাবেরাতের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ঃ ১৯২২, পৃষ্ঠা ৮-১৩, এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৯-১২)।*

শূরার প্রতিনিধিবৃন্দের কর্তব্য ঃ

মজলিসে মুশাবেরাতে যেসব প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করে তাদের প্রতিনিধিত্ব এখানকার কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে শেষ হয়ে যায় না বরং তারা এক বছর পর্যন্ত জামাতের প্রতিনিধি থাকেন। আর তাদের কর্তব্য, তারা যেন সংবছর লোকদের তাকিদ দিতে থাকেন এবং সেসব কথা তাদেরকে পুনঃ পুনঃ বলতে থাকেন যা এখানে অনুমোদন করা হয়েছে *(রিপোর্ট মোশাবেরাত ঃ ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৪৫)।*

শূরার ব্যাপারে আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

এ মজলিসের নাম মজলিসে মুশাবেরাত বা পরামর্শ সভা। এর নাম থেকেই এর দায়িত্বাবলী চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু লোক এর নামকে ভুলে যায়। এ নামকে খুব ভালভাবে মনে রাখা দরকার যে, এটা মজলিসে মুশাবেরাত। আর এখানে ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার সম্বলিত বিষয়াদি উপস্থাপিত হওয়া উচিত নয় *(রিপোর্ট মোশাবেরাত ঃ ১৯২৫, পৃষ্ঠা ১৮)।*

সাব-কমিটির সদস্যগণের জন্যে নির্দেশনা ঃ

সাব কমিটির মাঝে এমন সব নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যারা যথেষ্ট সময় দিতে পারেন আর এসব বিষয়াদির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা রয়েছে। যোগ্যতা দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি মেধাগত যোগ্যতা। এর এটা উদ্দেশ্য নয়, তারা গ্রাজুয়েট হোক অথবা বিশেষ সীমা পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণকারী, বরং নিষ্ঠা, খোদা-ভীতিই এমন গুণ যা কোন ব্যক্তিকে ধর্মীয় কাজে যোগ্য বলে প্রমাণিত করতে পারে *(রিপোর্ট মোশাবেরাত ঃ ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ২)।*

শূরার সাব-কমিটির সভায় সদস্যগণের অনুপস্থিতি ঃ

মজলিসে মুশাবেরাতে নির্ধারিত সাব কমিটির সভায় ডাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তিবর্গ কোন জবাব দেয় না বা উপস্থিত থাকে না তাদের নাম মজলিসে মুশাবেরাতে উপস্থাপন করা উচিত এবং ৩ বছর পর্যন্ত তাদেরকে সাব-কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা থেকে বিরত রাখা উচিত।

সাব-কমিটির কার্যক্রম ঃ

চেষ্টা এটা হওয়া উচিত যে, মতামত যেন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। না হতে পারলে অধিকাংশের মত লেখা হোক। কিন্তু যদি স্বল্পসংখ্যক মনে করে যে, তাদের মতামত এটাই এবং এটাকে অবশ্যই যেন উপস্থাপন করা হয় সেক্ষেত্রে তাদের মতামতও যেন লেখা হয় *(রিপোর্ট মোশাবেরাত ঃ ১৯২৯, পৃষ্ঠা ৭৭)।*

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ঃ

(১) মজলিসে সূরার সদস্য পদের যদিও পবিত্রতা রয়েছে, কিন্তু এ পবিত্রতার একটা সরাসরি সম্পর্ক জামাতের তাকওয়ার সাথে রয়েছে।

(২) আপনার যদি পসন্দ আল্লাহ্‌র পসন্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে আপনার পসন্দ উত্তম।

(৩) আপনারা সবাইকে পয়গাম দিবেন কারণ যা মজলিস শূরাকে বলছি তা সবাইকে বলছি- তোমাদের প্রত্যেক নির্বাচনকে গায়রুল্লাহ্‌মুক্ত করে দাও; (আল্লাহ্ ব্যতীত যেন কেউ না থাকে) নিজেদের চৌধুরীপনা (অহংকারকে) - কে বের করে দাও। নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে বের করে দাও। কেবলমাত্র একটি সম্পর্ক কায়েম রাখো- শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যেন কায়েম থাকে।

(৪) আমি মনে করি তিনটি বিষয় মজলিসে শূরার মাঝে বরকত বা কল্যাণ বয়ে আনবার জন্যে এবং আধ্যাত্মিকভাবে মজলিসে শূরাকে জীবন্ত রাখবার জন্যে জরুরী (ক) প্রথমতঃ ইস্তিগফার করতে করতে উপস্থিত হবেন (শূরার আগে সদকা করাও কুরআনী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত - সংকলক); (খ) নিজের পুণ্যসমূহকে উজ্জ্বল করুন; (গ) নিজে সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হোন (উত্তম পোষাক হলো তাকওয়ার পোষাক-আল্ কুরআন - সংকলক) [২-৪-৯৩ তারিখের খুতবা]।

(৫) শূরা চলাকালীন এরূপ কোন কিছু বলা বা করা উচিত নয় বা কোন ভাই-এর মনঃকষ্টের কারণ হয়।

(৬) মজলিসে শূরার সাফল্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পস্পর ভাই-ভাই হয়ে থাকার মাঝে নিহিত। এমতাবস্থায়ই পরামর্শ গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও তাকওয়াভিত্তিক হয়।

(৭) পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতি না থাকলে পরামর্শ অর্থহীন ও অবান্তর হয়ে থাকে বরং প্রায়শঃ ক্ষতিকর হয়।

(৮) শূরা আমানতস্বরূপ হয়ে থাকে। এর সেটুকু বলা যায় যেটুকু বলার অনুমতি থাকে (১৫-৪-৯৪ তারিখের খুতবা)।

সংকলন ও অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(০৭-০১-০৩ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেন মাওলানা ফিরোজ আলম)

প্রশ্ন নং ১ ঃ কেউ যদি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করতে চায় তো কোন্ অংশ থেকে আরম্ভ করা উচিত?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ সাধারণভাবে 'আম্মা-পারা' থেকে শুরু করা হয়ে থাকে। এ পারায় বেশ কয়টি ছোট ছোট সূরা আছে যেগুলো মুখস্থ করা সহজ। আর সূরা ফাতিহা তো প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে। এরপর অন্য সূরা আরম্ভ করা আবশ্যক।

হুযূর প্রশ্নকর্তাকে একটি কৌতুক বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি এ কৌতুক বললেন ঃ "এক বাড়ীতে এক মেহমান বহুদিন ছিল। একদিন মেজ্বান খুব কাঁদতে শুরু করলো। মেহমান জিজ্ঞেস করলো, তিনি এত কাঁদছেন কেন? মেজবান বললো, আপনি তো আর আমাদের বাসায় আসবেন না তাই কাঁদছি। মেহমান উত্তর দিল, না মন খারাপ করবেন না আবারও আসবো। তখন মেজবান বললো- আপনি গেলে তো আরেকবার আসবেন।

প্রশ্ন নং ২ ঃ হুযূর, সূরা ফীলে ছোট পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিরাট হাতীও তৃণ হয়ে গিয়েছিল। বাস্তব দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আবাবিল পাখীরা যে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করেছিল ওগুলো তারা এমন একটি অঞ্চল থেকে এনেছিল যেখানে বসন্ত মহামারি ছিল এবং সেই রোগের জীবাণু পাথরগুলোর গায় লেগে ছিল। ফলে হাতিগুলো বসন্তরোগের শিকার হয়ে মারা গিয়েছিল।

হুযূর আরো বলেন, সেই সময় হযরত আব্দুল মোত্তালেব-এর উঠ হারিয়ে গেলে তিনি আক্রমণকারী বাহিনীর নেতা আবরাহা কাছে উট উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। আবরাহা আশ্চর্য হ'ল এবং বললো, আপনি কা'বা গৃহের ব্যাপারে আমাকে আক্রমণ বন্ধ করতে বললেন না, এর কারণ কি? তখন হযরত আব্দুল মোত্তালেব বলেছিলেন, আমি উটের মালিক তাই উটের উদ্ধারে ব্যস্ত; কা'বাগৃহের মালিক তিনি, মানে স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা তিনিই কা'বা গৃহের রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন। হুযূর বলেন, সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পরেই আবাবিল পাখীরা হাতি বাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল।

হুযূর ২টি কৌতুক বলেন ঃ (১) এক ব্যক্তি কারো ঘরে মেহমান হিসেবে গিয়েছে। প্রত্যেক দিন ডালই পাক করে খাওয়ানো হচ্ছে। এমন কি এক পর্যায়ে চাঁদের চৌদ্দ তারিখ এসে গেছে। ডাল আর বদলায় না। মেহমান তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলো, আজ চাঁদের কত তারিখ। মেহমান বললো, চাঁদের তারিখ জানি না তবে ডালের আজ চৌদ্দ তারিখ!

(২) এক মৌলভী সাহেব অশিক্ষিত ছিলেন; কিন্তু মৌলভী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৩০টি পাথর রেখে দিয়েছিলেন। প্রতি দিনের সাথে সাথে একটি করে পাথর সরিয়ে দিতেন। লোকেরা লোকেরা তারিখ জিজ্ঞেস করলে পাথর গুণে তারিখ বলে দিতেন। কোনক্রমে ছেলে-মেয়েরা দেখে ফেলে মৌলভী সাহেব কী করেন। তারা এ পাথরের সাথে আরও প্রায় ২০০ পাথর ভরে দিয়েছে। এরপর কেউ তারিখ জিজ্ঞেস করলে অনেকক্ষণ পরে মৌলভী সাহেব বল্লেন, তারিখ তো ২০০-এর মত হবে। তখন সবাই বল্ল, মৌলভী সাহেব আল্লাহ্কে ভয় করুন। মৌলভী সাহেব বল্লেন, ভয় করে ২০০ বলছি নয়ত আরও বেশি বলতাম!

প্রশ্ন নং ৩ ঃ ধর্মের ক্ষেত্রে কি সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন মূল্য আছে? অ-আহমদীগণ বলে থাকেন, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এজন্য তারা যা বলবে তা-ই ঠিক বলে গণ্য হবে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ ধর্মের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বড় কথা নয়; সত্য হচ্ছে বড় কথা। পৃথিবীতে অনেক দেশেই খৃষ্টান বা বৌদ্ধদের সংখ্যা বেশি। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই বলে ওসব দেশের মুসলমানরা কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সব কথা মেনে নিবে? আবার অ-আহমদী মুসলমানরা ও দলাদলিতে ব্যস্ত তাদের মাঝে ঐকমত্যের খুবই অভাব। তাই তো পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ **তাহ্সাবুহুম জামিআন ওয়া কুলূবুহুম শাত্তা** অর্থাৎ দেখতে মনে হবে তারা সংখ্যায় খুব বেশি ও ঐক্যবদ্ধ কিন্তু মনের দিক দিয়ে তারা বিভক্ত।

হাদী সাহেব একটি কৌতুক বলেন- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একদিন ঝগড়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর কারও সাথে কেউ কথা বলে না। স্বামী চায় স্ত্রীকে কথা বলতে; কিন্তু সে কোন মতেই কথা বলতে চায় না। একদিন রাত্রে যখন সে ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ মধ্য রাতে স্বামী উঠে একটি মোমবাতিতে আগুন ধরিয়ে এদিক সেদিক সারা ঘরে ঘুরছেন আর কী যেন খুঁজছেন। অনেক খুঁজতে খুঁজতে সে মোম বাতিটা নিভাচ্ছেই না। তখন স্ত্রী বললো, তুমি কী খুঁজছো? তখন স্বামী বল্লো, পেয়েছি। স্ত্রী বল্লো, কি পেয়েছো। সে বললো, কথা পেয়েছি।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ শিশুর জন্মের পর বেশ কয়েক মাস মা ভালমত ঘুমাতে পারে না। অনেক সময় রাতের শেষ দিকে একটু ঘুমায়। ফজরে উঠা কঠিন হয়ে যায়। ওসব দিনে কি ফজর নামাযের জন্যে নিজের স্ত্রীকে জাগানো স্বামীর উচিত।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ মা যতই রাত জাগুন না কেন নামাযের সময় তাকে ঘুমুবার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। আল্লাহ্ ইচ্ছা বা নিয়্যত দেখেন। যারা নামাযের জন্য সময়মত উঠতে চায় তাদের ঘুম ভাঙ্গাবার ব্যবস্থা আল্লাহ্-ই করে দেন।

এক বুযুর্গের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি কোন কারণে বেশ কয়েক দিন ভালভাবে ঘুমাতে পারেন নি; কিন্তু তিনি আল্লাহ্র

নিকট আন্তরিকভাবে দোয়া করতেন, তার যেন তাহাজ্জুদ নামায ছুটে না যায়। তিনি এ দোয়া করে এক গাড়িতে উঠে সফরে যাচ্ছিলেন। রাতে তাঁর মাথায় উপর থেকে কোন জিনিস পড়ে। এটা ছোট দুর্ঘটনাই ছিল, কিন্তু তার খুব বেশি আঘাত লাগে নি। তিনি দেখলেন, তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে তাই তিনি এটাকে আল্লাহ্‌র দেয়া একটা নিশান মনে করে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়লেন।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, এক বুযুর্গের একদিন তাহাজ্জুদ নামায এ কারণে ছুটে গিয়েছিল যে, শয়তান বাধা দিয়েছিল। তার পরের দিন সেই বুযুর্গ সারাদিন এতই কান্নাকাটি করলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইলেন এতে আল্লাহ্ তাকে বহুগুণ পুণ্য দিয়েছিলেন। পরে সেই বুযুর্গকে শয়তানই তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছিল। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বল্লো, আমি শয়তান। বুযুর্গ জানতে চাইলেন সে কেন জাগাচ্ছে? শয়তান বল্লো, কাল তোমার নামায নষ্ট করার কারণে তুমি কান্না-কাটি করে এত পুণ্য কামিয়েছো যে আজ তোমাকে জাগিয়ে দিচ্ছি যাতে তুমি আর এত পুণ্য অর্জন করতে না পার।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ হল্যান্ডে এক গয়ের আহমদী বোন বলেন যে, স্বপ্নে তার মরহুম পিতা তাকে বিভিন্ন বিষয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তিনি আরও বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব সত্য মাহ্‌দী নন। এমন মহিলাকে কী উত্তর দেয়া যেতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ মহিলাকে বলা উচিত, এটা আপনার আত্মার ধোঁকা। কেননা, সারা পৃথিবীতে এমন হাজার হাজার আহমদী আছেন যারা স্বপ্নে সত্য দেখে তাঁকে মেনেছেন। হাজার হাজার মানুষের সত্য-স্বপ্নের প্রেক্ষিতে এক মহিলার স্বপ্নের কোন মূল্য নেই। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে পিপির বান্ডেওয়ালা নামে এক ব্যক্তি মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সত্য কিনা তা জানার জন্যে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ্! তুমি বলো, মির্যা সাহেব সত্য কিনা। ফজরের নামাযের পর তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেছেন রসূলে করীম (সঃ) এসেছেন এবং তাঁকে তিনি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ) তাকে বলেন, তিনি সত্য মাহ্‌দী। চাঁচড়া শরীফের পীর সাহেবও স্বপ্নে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। এগুলোর মোকাবেলায় এ মহিলার কথা সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ কোন কোন আহমদী প্রেসিডেন্ট বা অন্য কোন কর্মকর্তার সাথে অভিমানের কারণে মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়। বুঝালেও বুঝে না। এমন লোকদের কীভাবে বুঝানো যেতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ তাদেরকে রসূলে করীম (সঃ)-এর নির্দেশ মনে করিয়ে দেয়া দরকার। যাকে ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার পেছনে নামায পড়তেই হবে, পসন্দ হোক বা না হোক। কুরআনে নির্দেশ রয়েছে- **ফাযাক্কির ইন্ন ফায়াতিয্ যিক্‌রা**-অর্থাৎ বার বার নসীহত করতে থাক এতে কল্যাণ রয়েছে।

সিয়ালকোটের মসজিদের কাছে এক ব্যক্তি থাকতেন। সে মসজিদে আসতো না। তাকে বার বার বুঝানো সত্ত্বেও মসজিদে আসে না। আমার কাছে এ খবর পৌঁছে। আমি জানতে চাইলাম নামাযের কথা বল্লে, সে কি বলে। সে প্রথম বলে, শুকরিয়া পরে গালাগালি শুরু হয়ে যায়। কেন তাকে বিরক্ত করা হলো। আমি তাদেরকে তার পিছু ছাড়তে না করলাম। এক রাত্রে এমন হয়েছে যে, আমি সে এলাকায় সফরে গিয়েছি। ফজরের সময় প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। মসজিদে আর কেউ নেই। আমি মসজিদে একা, তখন নামাযের সময় আমার সাথে এক ব্যক্তি এসে শামেল হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বল্লো, আমি সেই ব্যক্তি আপনারা যাকে ডাকার ব্যবস্থা করেছেন। এখন আল্লাহ্‌র ফযলে আমাকে ডাকতে হয় না। আল্লাহ্ অবস্থা পাল্টে দিয়েছেন। নামায ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তাই সব সময় নসীহত করতে থাকতে হবে এতে সুফল লাভ হবে।

কৌতুক - এক গ্রামে একজন মৌলবী তার সাগরেদকে পাঠিয়েছে ওয়াজ করার জন্যে। ছোট মৌলভী ওয়াজ করতে করতে একবার বলে ফেল্লু, মহিলাদের কাপড়ে বানানো কাঁথা পুরুষদের ঘুমানো না-জায়েয। শীতের দিন ছিলো। তিন দিন ওয়াজ করার সময় বেচারা শীতে খুব কষ্ট পেল। গ্রামবাসী ভয়ে তাকে কাঁথা দেয় নি। পরের দিন সে তার ওস্তাদজীকে তা জানালে ওস্তাদজী বল্লেন, আরে বেকুফ; তুই গরম কালের ওয়াজ শীতকালে কেন শুনিয়েছিস!

আবার, এক মৌলভী সাহেব খুব ওয়াজ করলেন, তার বক্তৃতায় কারও কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কেবল এক বুড়ো বসে বসে হাউ মাউ করে কাঁদছিল। মৌলভী সাহেব তাকে ডেকে তার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তুমি আমার ওয়াজে এমন কি পেয়েছ যে কাঁদছ? সে বুড়ো বল্লো, আপনার বক্তৃতার আমি কিছুই বুঝি নি। তবে আপনি এমনভাবে ওয়াজ করছিলেন কিছুদিন আগে আমার ছাগলটি যেভাবে ছটফট করে মারা গিয়েছিলো সেভাবে। তার গলা থেকে আপনার মত আওয়াজ বের হচ্ছিল। তাই আমি কাঁদছি।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কোন স্ত্রী ধর্মের প্রতি উদাসীন হলে তার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ নসীহত করতে থাকুন। **ফাযাক্কির ইন্না ফায়াতিয্ যিক্‌রা।**

প্রশ্ন নং ৮ ঃ হাদীসে আছে যে, আপনার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাঈলের নবীদের তুল্য। একথার অর্থ কী? এটা কোন যুগের আলেমদের কথা হয়েছে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ কুরআন শরীফে এসেছে **ইন্নামা ইয়াখশাআল্লাহ্ মিন ইবাদিহীল উলামা**- সত্যি আলেম তারা যারা খোদাকে ভয় করেন। সেই যুগের আলেমদের কথা বলা হয় নি যারা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে। যাদের হৃদয়ে ভয় নেই। রসূলে করীম (সঃ)-এর উম্মতের আলেমদের দেখুন তাদের পদ মর্যাদা কী। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর শান মকাম ও মর্যাদাকে দেখুন। এত বড় পদমর্যাদার মানুষ যে আগের নবীদের মাঝে এমন শান দেখাবেন না। যদি পূর্বে আসতেন তাহলে নবী হতেন। অথচ তিনি এ উম্মতের একজন আলেম। তিনি নবীর পদমর্যাদা রাখতেন। আর হযরত উমর (রাঃ) সম্বন্ধে তো রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, হে উমর! যদি আমি নবী না হতাম তাহলে তুমি নবী হিসেবে

প্রেরিত হতে। অথচ তিনি এ উম্মতের একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ পাখীরা ফজরের নামাযের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সময় গান গায়; প্রশ্ন হলো তারা সময় কীভাবে বুঝতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা সেসব পাখীদের ভেতরেই এমন একটি ঘড়ির মত ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন যেটা পাখিকূলকে সময় সম্পর্কে অবহিত করে।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন, পাখী কীভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় এসে রাতের শেষ প্রহরে গান গায়। তাদের ব্রেইনে এমন একটি ঘড়ির মত ব্যবস্থা আল্লাহ্‌তাআলা রেখেছেন যাতে তারা নির্দিষ্ট সময় গান করতে পারে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ হুযূর স্মৃতিশক্তি কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ বলা হয় পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার চেষ্টা করলে স্মৃতি-শক্তি বাড়তে পারে। দোয়ার মাধ্যমেও তা বাড়তে পারে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ সাপের বিষ মানুষের কোন উপকারে আসে কিনা।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ সাপের বিষের অনেক উপকারী দিক আছে। সাপের বিষ থেকে অনেক ঔষধ তৈরী হয়। হোমিওপ্যাথিতে লাকেসিস, নেজা প্রভৃতি ঔষধ সাপের বিষ থেকে তৈরী। তেমনি দেশী হেকিমী ঔষধেও সাপের বিষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ বরফ পড়ে কেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ যখন মেঘ অনেক অনেক উপরে চলে যায় এবং শীত পড়ে তখন মেঘের ভেতরের পানি বাষ্পাকারে থাকে সেই পানিটাই একেবারে বরফ বা শিলাতে রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ ইসলামে হজ্জ কখন ফরয হয়েছে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হজ্জ তো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগেই আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু ইসলামের পূর্বে ওটা এক ধরনের মেলা বনে গিয়েছিল অর্থাৎ ধর্মীয় ভাব ছিল না। নাচগান কবিতা ইত্যাদি হ'ত। ইসলাম আসার পর আবার হজ্জকে সংস্কার করা হ'ল এবং আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম অনুসারে হজ্জের ধর্মীয়ভাব পুনঃ স্থাপন করা হ'ল এবং নাচ গান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হ'ল।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইসলামে প্রতিবাদের অনুমতি আছে কিনা।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই এ অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং এটাই আসল জেহাদ। হুযূর (সঃ) বলেছেন, জালেম রাজা বা শাসনকর্তা যদি জুলুম ও নির্যাতন করে তো তাঁর সামনে এ কথা যদি বলা হয় যে, আপনি অন্যায় করছেন এটাও জেহাদ এবং সাহস প্রদর্শনকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ অমুসলমানের কবরে হুযূর (সঃ)-এর শিখানো দোয়া করা যায় কিনা?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, **আস্‌সালামো আলায়কুম ইয়া আহ্‌লাল্ কুবূর**- বলতে পারেন। আমরা কি জানি কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়; কিন্তু এমন জায়গা যেখানে হিন্দু বা খৃষ্টানদের জন্যই নির্দিষ্ট কবর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেখানে দোয়া করা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ দাজ্জাল মক্কা আর মদীনা ছাড়া সবখানে প্রবেশ করবে-এ হাদীসের অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা ঠিক নয়। একটি হাদীসে দেখা যায় যে, মাহ্‌দী খানা কা'বার তাওওয়াফ করছে আর দজ্জাল তার পিছে পিছে যাচ্ছে। দজ্জাল তো সেখানে পৌঁছে গেছে।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ হুযূর আপনি কোন এক ৩১শে ডিসেম্বর রাতে কোন এক ষ্টেশনে নামায পড়েছিলেন। সেটা কখন ও কোন্ ষ্টেশনে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হিউসটন ষ্টেশনে হুযূর ৩১শে ডিসেম্বর রাতে নামায পড়ছিলাম। রাত তখন ১২টা বেজে যায় নতুন দিন আরম্ভ হচ্ছিল। আমি ভাবলাম, আমার নামায পড়া দরকার। নামাযের পর যখন সালাম ফিরালাম তখন এক ব্যক্তি এসে বললেন, মানুষতো বিলাসিতা আর সকল প্রকার উশৃংখলতায় মগ্ন আর আপনার নামাযের চিন্তা হচ্ছে!

সংকলন ও অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

স্মৃতি কণা

ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত

মাসিক মদীনা প্রকাশের প্রথম দিকে এতে আমার বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কথা প্রসঙ্গে বলেন, অনেকেই নাকি বলতেন, কাদিয়ানীর লেখা কেন ছাপান? উত্তরে মাওলানা সাহেব বলেছিলেন- এর চেয়ে ভাল লেখা ছাপাতে পেলেই কাদিয়ানীর লেখা ছাপানো হবে না। যাক্ সেসব কথা।

একদিন মাওলানা সাহেব আমার অফিস রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলছিলেন, লেখা ছাপানোর টাকা দিতে হবে যা আদায় করতে এসেছি। আমি বল্লাম, 'মাওলানা সাহেবের যত উল্টা-পাল্টা কথা। আমার লেখা ছাপানোর দরুন আমাকেই টাকা দিতে হবে। মগের মুল্লুক আর কারে কয়।' মাওলানা সাহেব বল্লেন, লেখা ছাপানোর টাকা নয়- এ হলো চেয়ার ভাংগার টাকা। আপনার লেখা দাঁড়ির আড়ি একজন পড়ছিলাম ও তিনজন মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। এক জায়গায় এসে সবাই জোরে হাসি দেয়ার সাথে সাথে চেয়ার ভেংগে পড়ে। সে চেয়ারগুলোর দাম চাই। ছোটখাটো দৈহিক ব্যথার কথা তো বাদই দিলুম।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কবিতা

কে বলে তুমি নেই?

খবর এসেছে মহান তাহের আর নেই।
দৌড়ে গিয়ে MTA খুললাম যেই-
দেখি তিনি দিব্বি বসে আছেন,
বাংগালী আসরে তিনি কথা বলছেন।
প্রশ্নোত্তরে হাসাচ্ছেন সবারে যিনি,
কে বলে মৃত তাঁকে, না, না, জীবন্ত তিনি।
অমর যারা তারা মরতে পারে না কভু,
সাক্ষাৎ থেকে শুধু আড়ালে নিয়েছেন প্রভু।
নীল আকাশের পথে দেখা দেন বারে বারে,
দেখতে চাও, দেখে নাও MTA মাঝারে।
M যদি মির্যা হয় T তে হয় যদি তাহের
A যদি আহমদ হয় MTA তে তিনি জাহের।
সদা দর্শন দেন তিনি বিশ্ব সংসারে
মৃত্যু কি করতে পারে গ্রাস, ধ্বংস তাঁহারে?

- আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সমস্ত বিশ্বের ওপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীনের আশীষ ও কল্যাণ

মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(৩য় কিস্তি)

মানবতার জন্য রহমত

আমি যখন সৃষ্টির সবকিছুর মাঝে মানুষের ইবাদতকে দেখলাম। তার ভুল-ভ্রান্তি ও তওবার দিকে লক্ষ্য করলাম। তার বার বার ব্যর্থতা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াকে উপলব্ধি করলাম, আমার অন্তর আনন্দে নেচে উঠল। আমি বললাম, এ সুন্দর পৃথিবীতে এত ভাল মানুষ কত চমৎকার লাগছে! কত মোহনীয় বিষয়! কিন্তু যখন আমি এ আনন্দে উৎফুল্ল হচ্ছিলাম হঠাৎ করেই আমার দৃষ্টি কিছু মানুষের উপর পড়ে গেল যারা কাল রং-এর জুব্বা (লম্বা জামা) পরেছিল। বড় বড় দাড়ী ছিল তাদের মুখে, হাতে ছিল মোটা মোটা তসবীহ্ দানা, বড় গম্ভীর চেহারা, দেখে মনে হচ্ছিল তারা বড় বড় আলেম (ধর্মীয় নেতা)। তাদের আশে পাশে মানুষের ভীড়।

অনেক মানুষ তাদের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হচ্ছিল। এমন মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। তাদের চেহারায় তাদের জ্ঞানী আলেম হবার চিহ্ন ছিল। তাদের কথার মাঝে ভালবাসা ও ব্যথার গন্ধ ছিল। তারা মানুষদেরকে সম্বোধন করে বলছিলেন, "হতভাগ্য মানুষ! তোমরা কেন খুশী হচ্ছো? তোমরা কিসের আশায় জীবন যাপন করছ? তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা তোমাদের জন্যে কি বিরাট জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখে গেছে? সে আগুন তো নিভবার মত নয় যা গন্ধক দিয়ে জ্বালানো হয়েছে। সে অন্ধকার এত বড় অন্ধকার যে, ইহজগতের অন্ধকার সে তুলনায় কোন অন্ধকারই নয় বরং আলো, আর তা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। অতএব তোমরা কীভাবে খুশি হচ্ছো, মুক্তির আশা করছ কীভাবে? তোমরা জান না যে, পাক আর না পাকের মাঝে কোন মিল নেই। অতীতকে এখন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তোমাদের মাঝে কে আছে যে বলতে পারে, সে পাক (পবিত্র)। এবং আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের উপযুক্ত। তোমাদের মাঝে কে আছে যে বলতে পারে, সে পাক হতে পারবে? কারণ শরীয়ত তো পাক করে না বরং নাপাক (অপবিত্র) করে। আদেশ মানুষকে অনুগত বানায় না বরং নাফরমান (অবাধ্য) বানায়। কে আছে তোমাদের মাঝে যে সব আদেশ মানতে পারবে? যে একটি সামান্য আদেশ অমান্য করেছে সে সাথে সাথে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। খুব ভাল ভাল জিনিসকে এক ফোটা নাপাক পদার্থ অপবিত্র করে দেয় না? তোমরা কি করে মনে করেছ যে, তোমরা (পাক) পবিত্র অথবা পাক হতে পার? তোমাদের কি স্মরণ নাই যে, তোমাদের আদি পিতা আদম পাপ করেছিলেন? আল্লাহ্‌র কৃপাকে ভুলে গিয়েছিলেন। শয়তান তাকে ও তার স্ত্রী হাওয়া (তোমাদের মা)-কে বিপথগামী ও পাপী করেছিল? তোমরা তো তাদের সন্তান? তোমরা কি করে ভাবতে পার যে, তোমরা তাদের পাপের অংশ ওয়ারীশ সূত্রে পাবে না? তোমরা কি আশা কর যে, তোমরা তাদের সম্পদ তো লাভ করবে কিন্তু ঋণ চুকাবে না? তাদের পুণ্যের অংশীদার হবে আর পাপের অংশীদার হবে না? আর যখন পাপের অংশীদার হয়েছ ওয়ারীশসূত্রে তো তার অভিশাপের অংশ থেকে কী করে বাঁচতে পার? তোমরা মনে করেছ আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন? নির্বোধ তোমরা! তিনি যেমন দয়াময় তেমনই তিনি ন্যায়-বিচারকও বটেন। তাঁর দয়া তাঁর বিচারের বিপরীত চলতে পারে না। সুতরাং কি করে সম্ভব যে, তিনি তোমাদের কারণে ন্যায় - বিচারকে ভুলে যাবেন?

আমি দেখলাম, তাদের বক্তৃতায় ছড়ানো হতাশা এতই প্রবল ছিল যে, আশার পাহাড়গুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। যেসব চেহারা খুশীতে ঝলমল করছিল হতাশা ও নিরাশায় ভরে গেছে। পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা একটি খেলনা তা-ও আবার ভাঙ্গা খেলনা মনে হতে লাগল। কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণ বিরতির পর সেই আলেমরা উচ্চস্বরে জনতাকে সম্বোধন করে বলতে আরম্ভ করল, "তোমরা হতাশ হবে না! তোমাদের যেখানে আশাভঙ্গ হয়েছে সেখানে আশার সঞ্চারেরও ব্যবস্থা আছে। যেখানে ভয় দেখানো হয়েছে সেখানে শুভ সংবাদও দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র ন্যায়-বিচার তোমাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কৃপা তোমাদেরকে রক্ষা করেছে। তা এভাবে যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন যেন তাকে তোমাদের পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। ক্রুশে ঝুলানো হয়। সত্য হয়েও যেন মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত হয়। সুতরাং সেই পুত্র 'মসীহ্' রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইহুদীরা তাকে বিনা দোষে ক্রুশে ঝুলিয়ে দেয়। এবং এভাবে তিনি সকল ঈমানদারদের পাপ মোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা তার উপর ঈমান আন। সে তোমাদের পাপ নিজ কাঁধে তুলে নিবেন। এভাবে আল্লাহ্‌র ন্যায়-বিচারও প্রতিষ্ঠা হবে এবং দয়াও প্রদর্শিত হবে এবং সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে। আমি দেখলাম, তারপর হতাশা দূর হয়েছে। মানুষ আনন্দে মেতে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবী এত খুশী হয়েছে যার কোন নজির ইতোপূর্বে কেউ দেখে নি। মানুষ আসতে লাগল এবং ক্রুশ, যা তাদের মুক্তি কারণ, এর সাথে লেগে কাঁদতে লাগল। অস্থির হয়ে হয়ে চুমু দিতে লাগল। আবার বুকে লাগাতে লাগল। মোটকথা এক উন্মাদনার সাথে জোশের সাথে ক্রুশকে তারা স্বাগতম জানাল।

কিন্তু আমি দেখলাম, যখন তাদের উত্তেজনা কমে গেল তখন তারা পরস্পর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করছে। বলছে, এ কথাকে বুঝলাম যে, মানুষ পাপ হতে বাঁচতে পারে না, কিন্তু যে শুভ সংকেত দেয়া হোল তা তো বুঝলাম না। খোদার জন্য আদল ইনসাফ (ন্যায়বিচার) যদি আবশ্যক হয়, তবে তা পুত্রের জন্যও আবশ্যক হবে! যদি পাপীর পাপ ক্ষমা করা আদল এর খেলাপ হয় তবে পাপহীন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়াটাও আদল এর খেলাপ। এটা কি করে সম্ভব হোল যে, খোদার পুত্র সকলের পাপ নিজ কাঁধে তুলে নিল, এবং খোদাও সেই নিষ্পাপ পুত্রকে ধরে শাস্তি দিয়ে দিলেন?

তারপর তারা বলল, আমরা একথা বুঝলাম না যে, মৃত্যুকে তো পাপের শাস্তি বলা হয়েছে; কিন্তু যখন পাপ বাকী থাকল না তো মৃত্যু কেন বাকী রয়ে গেল? পাপ ক্ষমা হয়ে যাবার পর মৃত্যুকেও তো থেমে যাওয়া উচিত ছিল!! আবার কেউ কেউ বলছিল, পাপ তো জন্মসূত্রে বা ওয়ারীশ সূত্রে পাওয়া, কিন্তু এখনও তো আমাদের দ্বারা পাপ হয়ে যায়। এবং শত চেষ্টা করেও কেন পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি না? যখন কেউ কেউ এমন বলতে লাগল, তখন এদের দেখা দেখি অন্যরাও বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমাদেরও তো এমনই অবস্থা!

তারপর আমি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখলাম, তারা বলছে, আল্লাহ্ আমাদিগকে কেন সৃষ্টি করেছেন? মানবতা তো অনেক বড় ভাল জিনিস মনে করা হয়েছে- তবে তা নাপাক (অপবিত্র) কেন হোল? কীভাবে পাপের মাধ্যমে তার বীজ প্রোথিত হোল, আর কীভাবে সে পাপের মাঝ দিয়ে বর্ধিত হোল? এবং পাপই তার খাদ্য হোল কেন? এবং পাপই উপরের আবরণ ও নীচের আস্তর হোল? এমন নাপাক বস্তুকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই বা কী হতে পারে? জান্নাত কী জিনিস, কার জন্য? কারণ আমরা তো হতাশা ব্যতীত আর কিছুই দেখছি না। দোযখ ছাড়া আর কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না। তারা এসব চিন্তা-ভাবনার মাঝেই ছিল। এমন সময় হঠাৎ সেই সুমধুর স্বর (আওয়াজ) বড় চিত্তাকর্ষক স্বর (আওয়াজ) যা আগে অনেকবার সমস্যার সমাধান দিয়েছে আবার উচ্চারিত হোল, সে গীত আবার সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করল। প্রত্যেকের কান আবার শুনতে লাগল, প্রত্যেকের হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হোল। সেই বাণী উচ্চারিত হোল এবং পৃথিবীকে একটি সুদীর্ঘ পয়গাম শোনাল। তার সারমর্ম আমি নিজ ভাষায় বিভিন্ন রূপক উপমার মাধ্যমে বর্ণনা করছি। সে বলল, 'যে কারো অন্তরে হতাশা সৃষ্টি করে সে মূলতঃ তাকে ধ্বংস করে। ঈমান তো ভয় ও সম্ভাবনা এবং আশার আলোর মাঝে সৃষ্টি হয়। তাও আশা ও সম্ভাবনা ভয়ের উপর প্রাধান্য রাখে। (ভয় অল্প আশা বেশি) সুতরাং যে আশার আলোকে নিভিয়ে দেয় সে পাপকে মিটায় না বরং বাড়ায়। সে আশংকাকে কম করে না বাড়িয়ে দেয়। আদম নিঃসন্দেহে ভুল করেছিলেন। কিন্তু সেটা ভুল ছিল, জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত পাপ ছিল না। এটাও সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে, বাপের কৃতকর্মের ফল ওয়ারীশসূত্রে পুত্রের মাঝে অবশ্যই সঞ্চারিত হবে। এটা যদি সত্য হোত তবে মূর্খ মা-বাবার সন্তানরা সব সময় অবশ্যই মূর্খ হোত। পৃথিবীর সকল যক্ষা রোগাক্রান্ত মা-বাবার সন্তানরা যক্ষাক্রান্ত হোত। কুষ্টরোগাক্রান্ত মা বাবার সন্তানরা কুষ্ঠ রোগীই হোত। কিছু জিনিস তো জন্মগত হয়। সব কিছুই জন্মগত হয় না। যেখানে জন্মগত কোন কিছু সৃষ্টি হয় সেখানে তা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থাও আল্লাহ্ রেখেছেন। জন্মসূত্রে পাওয়া অসুখ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তবলীগ (প্রচার) ও তা'লীম (শিক্ষার)-এর কোন উদ্দেশ্যই থাকত না। কাফির সন্তানদের ঈমান লাভ করা থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্তাআলা ঈমানের বিষয়টিতে জন্মসূত্রে প্রাপ্তির মাঝে আইনকে জারি করেন নি। ঈমানের বিষয়ে ওয়ারীশ সূত্রের আইন জারি হলো তো হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন অর্থহীন হোত। সে বলল, আল্লাহ্ মানুষকে পুণ্য কর্মের ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অনেকে এ শক্তিকে কাজে লাগায় এবং সাফল্য অর্জন করে। আবার অনেকে এ শক্তিকে পদদলিত করে এবং ব্যর্থ হয়ে যায়। শরীয়তের সমস্ত আদেশ-নিষেধ যদিও পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না, কিন্তু মুক্তির ভিত্তি আমলের উপর রাখা হয় নি। বরং ঈমানের উপর রাখা হয়েছে যা আল্লাহ্কে আকর্ষণ করে। আমল (কর্ম)-এর পূর্ণতার উপায়স্বরূপ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমল পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। তবে আমলের অভাব মুক্তিকে অসম্ভব করে না। বীজ হতে গাছ উৎপন্ন হয়। পানির দ্বারা গাছ বৃদ্ধি পায়। ঈমান বীজ এবং আমল পানিস্বরূপ, যা ঈমানকে প্রবৃদ্ধি প্রদান করে। কিন্তু বীজ যদি ত্রুটিপূর্ণও হয় এবং পানির সামান্য অভাবও হয় তবুও গাছ উঠতে পারে। কৃষকরা সর্বদা পানি দিতে ত্রুটি করে। কিন্তু তাই বলে ক্ষেত একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না যদি অনেক বড় ত্রুটি না হয়। মানুষের আমল ঈমানকে তাজা করে এবং এর স্বল্পতা ক্ষত সৃষ্টি করে। কিন্তু আমলের স্বল্পতা ঈমানকে সম্পূর্ণ বরবাদ করে দেয় না যদি সে স্বল্পতা শয়তানী এবং বিদ্রোহের পর্যায়ে না পড়ে এবং সীমাজ্ঞন না করে যায় তবে তা ঈমানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে না। আল্লাহ্র আদ্‌ল-ন্যায়-বিচার বা ইনসাফ তওবার পথ রোধ করে না।

'আদল' অর্থ এ নয় যে, শাস্তি দিতেই হবে। বরং আদল তো বলে যে, নিষ্পাপকে শাস্তি দিও না। সুতরাং পাপীর প্রতি দয়া করে তাকে ক্ষমা করা এটা আল্লাহ্র আদল বা ন্যায়-বিচার (Justice)-এর বিপরীত নয় বরং একেবারে যথাযত। আদল অর্থ যদি এই হয় যে, প্রত্যেক কর্মের ফল সেই কর্মের অনুরূপ হতে হবে, তবে ক্ষমা বা মার্জনা এবং মুক্তির অর্থ কী? এভাবে যদি পাপ ক্ষমা করা আদল-এর বিপরীত হয় কারণ আদ্‌ল অর্থ 'সমান সমান'। এটাই যদি সত্য হয় তবে তো এক জীবনের সীমিত আমলের (কর্মের) সুফল (মুক্তি) ও সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। তা-ও তার আমলের ওজনের বরাবর হওয়া উচিত। কিন্তু এ ধারণা কেউই গ্রহণ করবে না। তবে জানি না কেন আল্লাহ্র আদল-এর দোহাই দিয়ে সীমিত করা হয়েছে? সে বলল, আল্লাহ্ মালিক, সর্বাধিপতি বাদশাহ্! তাঁর জন্য পুরস্কার ও ক্ষমার সীমারেখা থাকতে পারে না। তিনি অবশ্যই ওজন করেন। কিন্তু ওজন তো এজন্য করেন যেন কারো ভাগে কম হয়ে না যায়। ওজন করা এজন্য নয় যে, কাউকে যেন বেশি দেয়া না হয়। মসীহ্ অবশ্যই নিষ্পাপ মানুষ এবং আল্লাহ্র রসূল ছিলেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে, তিনি অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার নিজের ক্রুশ বহন করতে হবে। যে নিজের ক্রুশ বহন করতে পারবে না সে মুক্তি পাবে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি ক্ষমা পেয়ে যায় আল্লাহ্র অনুগ্রহে এবং আল্লাহ্ তার বোঝা লাঘব করে দেন তবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। অতএব একথা বলা না হয়, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নাপাক বা অপবিত্র! হ্যাঁ, যে নিজে আল্লাহ্ প্রদত্ত পোশাক নিজে নষ্ট করে ফেলে সে নাপাক! নতুবা আল্লাহ্র সকল বান্দাই তাঁর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা রাখে এবং শেষ পর্যন্ত পেয়েও যাবে।

আমি দেখলাম, সেই আওয়াজ সেই মধুর বাণী উচ্চারিত হতে থাকল আর সাথে সাথে মানুষের হৃদয়ের জানালা খুলতে লাগলো। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক উজ্জ্বল হতে থাকল। হতাশা আশাও সম্ভাবনায় বদলে গেল। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্-ভীতিও সম্ভাবনার পাশাপাশি জায়গা দখল করল। প্রত্যেক ভুল নির্ভরতা এবং অযথা নিশ্চয়তার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যারা নিরাশ হয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল তারা আবার শয়তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। যারা খামাখা উচ্চাশা নিয়ে বসেছিল, নিজের বোমা অন্যের কাঁধে চালাবার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল, তারা দৌড়ে গিয়ে নিজের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিল। সকলের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। তৃপ্তি ও স্বস্তি সকলের অন্তরে স্থানান্তরিত হোল। তারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখল, মানবতা এবার খুশীতে নাচতে শুরু করেছে। আমার বুক থেকে আবার একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসল যেমন কোন প্রিয়তম হতে দূরে পড়ে থাকা প্রেমিকের বুক থেকে বের হয়। আমি দূর আকাশের কোথাও যুগের পরের অগণিত বাধা-বিপত্তিকে দেখলাম এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথানত করলাম। অতঃপর আবেগআপ্লুত হৃদয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসল, সে আওয়াজ ও কণ্ঠস্বর মানবতার জন্য রহমত প্রমাণিত হোল। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'

(২য় কিস্তি)

খেলাফত-এ রাশেদা

খিলাফত রাজত্বের নয়, নবুওয়তের স্থলাভিষিক্ত –এই খাঁটি বিশ্বাস থেকে খলীফাতুর রসূল হযরত আবূ বকর (রাঃ) এক তিলও সরতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং সরেনও নি। আঁ হযরত (সঃ)-এর মৃত্যুকে অকাল ও আকস্মিক মনে করে নও মুসলিমরা যখন দলত্যাগী অর্থাৎ মুর্তাদ হতে লাগলো, ভন্ড নবীরা যখন সশস্ত্র-বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, অবিশ্বাসী বেদুঈন গোত্রগুলো যখন ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করলো, অজ্ঞ মুসলিমরা যখন 'যাকাত' দিতে অস্বীকার করে বসলো, তখন দেখা গেল, একমাত্র মক্কা নগরী ছাড়া সারা আরবের সর্বত্রই বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। দার-উল খিলাফত মদীনার উপকণ্ঠ পর্যন্ত সে আগুন ধেয়ে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে। এ সময়েই উসামা বিন যায়েদের সেনাপতিত্বে সিরিয়া সীমান্তে এক অভিযান পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ)। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এই দারুণ মহাসংকটে বিচলিত হলেন মুসলমানরা, এমনকি, মহাতেজস্বী পুরুষ উমরও। উমর (রাঃ) এবং আরও অনেকেই বললেন, এ মহা বিপদের সময়ে মদীনাকে অরক্ষিত প্রায় রেখে সিরিয়া সীমান্তে অভিযান না পাঠানোই উচিত। তাদের এ কথার জবাবে খলীফাতুর রসূল বললেন,

'আবূ কোহাফার পুত্র কী এমন অধিকার রাখে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন তা সে বাতিল করে দেয়'?

তিনি আরও বললেন, 'যা হবার হোক! মদীনা থাকুক বা ধ্বংস হোক। খলীফা বাঁচুক নইলে মরুক, তবু রসূলুল্লাহ্‌র হুকুম পালিত হবে।' এবং পালিত হয়েছিল সেই হুকুম সেই 'খলীফাতুল মুসলেমীন'-এর দ্বারা, যাঁকে আল্লাহ্ সেদিন খাড়া করেছিলেন তাঁর রসূলের স্থলে। এবং তাঁরই (রাঃ) মাধ্যমে পুনরায় একবার প্রকাশিত হয়েছিল আল্লাহ্‌র শক্তি ও তাঁর কুদরত। পুনরায় বিজিত হয়েছিল জজিরাতুল আরব ইসলামের জন্য চিরতরে। মাত্র আড়াই বছরের মাঝেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর খলীফা হন হযরত উমর (রাঃ) ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে। প্রতাপশালী উমর হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রার্থনার একটি অতি উৎকৃষ্ট ফল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক সময় প্রার্থনা করেছিলেন,

"হে আমার প্রভু! আমার পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে অন্ততঃ একজন উমর দাও! হয় তুমি উমর বিন খাত্তাবকে, নয় তো উমর বিন হিশামকে পরিচালিত করো ইসলামের পথে ... এবং ইসলামের পথে পরিচালিত হয়ে উমর ইবনে খাত্তাব হলেন 'আমীরুল মু'মিনীন'। ইবনে হিশাম ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে বিকৃত হলো ইতিহাসে 'আবূ জাহল'রূপে। মানবেতিহাসের অগ্রগতির অন্যতম মহানায়ক, মহাবিজয়ী, মহান প্রশাসক, সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচারক, তদানীন্তন পৃথিবীর দু'টি পরাশক্তি পরাভূতকারী উমর (রাঃ) জীবন-যাপন করেছেন দীনহীন মানুষের মত। একজন ক্রীতদাসকে উটের পিঠে বসিয়ে পরাজিত জেরুজালেমে প্রবেশ করেছেন আরব, সিরিয়া, (মেসোপটেমিয়ার এলাকাস্থ) অধিপতি উমর চুক্তিপত্রে সই করার এবং আয়লাতে তাঁর ছেঁড়া পিরহান সেলাই করে দিয়েছেন। একজন বিশপ দুঃস্থ নারীর সন্তানদের জন্য আটার বস্তা বহন করেছেন 'রাজাধিরাজ' উমর। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর জেনারেল খালেদকে সৈন্যাপত্য থেকে অপসারণ করেছিলেন উমর এ জন্য যে, পাছে মানুষ বলে- 'ইসলামের বিজয় সে তো খালেদের বিজয়'। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছিলেন, উমর যে পথ দিয়ে যায়, সে পথ থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। এমন প্রবল প্রতাপান্বিত উমর বলেছেন, মুসলমান হওয়ার পর তিনি মক্কার অলিতে গলিতে মার খেয়েছেন। হযরত সালমান ফার্সীকে (রাঃ) একদিন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি কি সম্রাট, না খলীফা? উত্তরে সেই জ্ঞানী ও শ্রদ্ধেয় সাহাবী বলেছিলেন, 'তুমি যদি জনগণের কাছ থেকে জোর করে টাকা-পয়সা আদায় করে থাক, তুমি যদি রাষ্ট্রীয় ট্রেজারীর বায়তুল মালের সম্পদ তসরূপ করে থাক, তাহলে তুমি একজন বাদশাহ্, অন্যথায় তুমি খলীফা। এবং ইতিহাসের সাম্য এটাই যে, উমর বাদশাহ্ ছিলেন না, ছিলেন রসূলে খোদার খলীফা এবং সেই সূত্রে খলীফাতুল মুসলেমীন'।

হযরত উমর (রাঃ) শাহাদৎ বরণ করেন মুগীরার এক অযথা অসন্তুষ্ট খৃষ্টান ভৃত্যের হাতে, ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর, ইসলামের খলীফা নির্বাচিত হন হযরত উসমান (রাঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর যে সময় ভীষণ বিপদাবলী পতিত হচ্ছিল ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে যে বিপদের প্রচন্ড বজ্রাঘাতসমূহ পাহাড়ের উপরে পতিত হলে পাহাড়ও খন্ড-বিখন্ড হয়ে যেত, সেই সব বিপদের সামনে অটল থেকে তা সবই প্রতিহত করেছিলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং নিশ্চিহ্ন করেছিলেন সকল বিপদ। অতপর, হযরত উমরের আমলে পৃথিবীর এক সুবিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠেছিল ইসলামী সাম্রাজ্য, দার-উল-ইসলাম। ত্বরিৎ যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা সেদিনের পৃথিবীতে ছিল না। কিন্তু তথাপি, ঐক্য, সংহতি ও আনুগত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল সেদিনের সেই ইসলামী সাম্রাজ্যে। উমরের দোর্দন্ড প্রতাপের সামনে মাথা তুলতে সাহস করে নি সেদিন কোন দুষমন। কিন্তু, তাঁর শাহাদতের পরে ঘাপটি মারা শত্রুরা তাদের বিষাক্ত ফণা বিস্তার করতে থাকলো সংগোপনে, ধীরে ধীরে। প্রসার্যমান দার-উল-ইসলামের দূরবর্তী বহু স্থানে মুনাফিকরা, ইহুদী নাসারা-চক্রান্তকারীরা, দুষ্কৃতকারীরা স্বার্থান্বেষীরা খলীফার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা শুরু করে দিল। তারা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করলো, বিশেষতঃ গভর্ণরদের নিয়োগের ব্যাপারে। অথচ, তাঁর আমলের প্রায় সকল গভর্ণরই নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত উমরের আমলে। এরা যদি উসমানের আত্মীয়তার ব্যাপক পরিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকেন, তাতে তাঁর করার কিছুই ছিল না। তাঁর প্রশাসনের প্রথম পর্যায়ে ২/৩ বছরের মধ্যে কুফায় নিযুক্ত হয়েছিলেন ওয়ালিদ এবং মিশরে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাদ। অথচ, তখন কোন কথা ওঠে নি, কথা ওঠলো, তাঁর ১২ বছরের প্রশাসনের শেষ পর্যায়ে। অতএব, এ সমস্তই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুষমনদের বানোয়াট বাহানা। মুশকিলটা ছিল, দূরে-দূরান্তরে, বিভিন্ন প্রদেশে পরিচালিত সে সব অপ-প্রচারের তাৎক্ষণিক মোকাবেলা করার অসুবিধা। বেদুঈন গোত্রগুলোও তাই তাদের মিথ্যা প্রচারণার সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। হযরত উসমানকে হত্যা করার পিছনে মূল নায়ক ছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনে সাবা। এই লোকটি ইহুদী সে বাহ্যতঃ মুসলিম পরিচিতি ধারণ করেছিল ইসলামের ক্ষতি সাধন

করার জন্য। সে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়াতে থাকলো। প্রথম দিকে সে নাকাম হলেও পরবর্তীকালে সফলকাম হয়েছিল। এ ইহুদীটাই সেই ব্যক্তি যে প্রথম প্রচারণা শুরু করেছিল হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষে। 'আলীই খিলাফতের বৈধ উত্তরাধিকারী'। এই প্রচারণাটা কাজে এলো। নও মুসলিমরাও তাদের দলে ভীড়তে থাকলো। কারণ তারা বুঝতে চাইলো না যে, ইসলামী খেলাফত কোন উত্তরাধিকার-এর বিষয় নয়। এমন কি নবীর পার্থিব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিরও কেউ ওয়ারীশ হতে পারে না। নবীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিছু থাকলে তা সবই সদকা করার হুকুম। এটা নবুওয়ত এরই এক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অজ্ঞ মুসলমানরা, মুনাফিকরা তো বটেই, নও মুসলিমরাও ইহুদী চক্রান্তের করাল কবলে পড়লো। এবং ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ক্ষতি সাধনকারী শোচনীয় হত্যাকান্ডটি ঘটে গেল। দার-উল-ইসলামে তরবারি স্থাপিত হলো। গৃহ -যুদ্ধের আগুন জ্বলবার উপক্রম হলো দিকে দিকে। একটি মাত্র লোকের শয়তানী কার্যকলাপ মানুষের শান্তির ও নিরাপত্তার যে কত ব্যাপক ও কত সুদূর প্রসারী ক্ষতিসাধন করতে পারে, শান্তির ও নিরাপত্তার যে কত ব্যাপক ও কত সুদূর প্রসারী ক্ষতিসাধন করতে পারে ইহুদী ইবনে সাবা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা যায়, এই লোকটিই প্রথম 'শিয়া'। অথচ, হযরত আলীর তো কোন দাবী ছিল না খিলাফতের। তিনি তো প্রথম তিনজন খলীফার হাতেই 'বয়াত' করেছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই প্রাণপণ আনুগত্য করেছেন। তিনি সহযোগিতা করেছেন। আসলে ইবনে সাবার দল যা চেয়েছিল, তাহল ইসলামের ধ্বংস-সাধন। এবং তারা এভাবেই চক্রান্ত করে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল ইসলামী খেলাফতকে। কিন্তু, সেই ক্রুশে খিলাফতের মৃত্যু ঘটে নি। দুর্বল হলেও, ঐশী সহায়তায় ও পরিমন্ডলের সেই খিলাফতের প্রবহমান ধারাই নানাভাবে বিস্তারিত হয়ে চলেছিল পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে।

গভর্নরদের অপসারণের দাবীতে মিশর, বসরা ও কুফা থেকে এসে বিদ্রোহীরা মদীনা ঘেরাও করেছিল। অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে তারা শুধু মিশরের জন্য তাদের মনোনীত মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর এর নিয়োগপত্র আদায় করতে পেরেছিল। কিন্তু তাদের আসল যে উদ্দেশ্য ছিল খিলাফতের পতন সেই লক্ষ্যে সেই নিয়োগপত্র কিছুই ছিল না। তাই, তারা নিজেরা সেই নিয়োগপত্র বাতিল সম্পর্কিত একটি চিঠি জাল করলো। তাদের এই জাল চিঠিটা নিয়ে তারা পুনরায় মদীনা প্রত্যাবর্তন করলো এবং খলীফার পদত্যাগ দাবী করতে থাকলো, মদীনার আইন-শৃঙ্খলা তছনছ করলো।

পাঁচিল টপকিয়ে খলীফার ভবনে ঢুকে পড়ে হত্যা করা হয়েছিল অশীতিপর বৃদ্ধ খলীফা হযরত উসমানকে (রাঃ)। তখন তিনি পরিবার -পরিজন বেষ্টিত অবস্থায় শান্ত সমাহিত চিত্তে পবিত্র কুরআন পাঠ করছিলেন। পবিত্র কালামুল্লাহ্‌র যে কথাটির উপরে খলীফার রক্ত পড়েছিল, তা হচ্ছে ঃ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾

"অতএব, তারা যদি সেভাবেই ঈমান আনে, যেভাবে তোমরা এতে ঈমান এনেছ তাহলে তারা নিশ্চয় হেদায়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায়; তাহলে তারা শুধু ফাটল সৃষ্টিতেই (লিপ্ত)। অতএব তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (সূরা আল্ বাকারা ঃ ১৩৮)।

অবশ্যই, ফাটল সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। মুনাফিকরা প্রশ্ন তুলেছিল খলীফার যোগ্যতার। অথচ, যোগ্যতার মালিক যে আল্লাহ্ সেই আল্লাহ্‌ই তো মনোনীত করেছিলেন উসমানকে তাঁর খলীফা।

আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং কুরআন করীমের হেফাযতকারী ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"আমরাই এ যিক্‌র (আল্ কুরআন) অবতীর্ণকারী এবং আমরাই এর পূর্ণ হেফাযতকারী' (১৫ঃ১০)।

আক্ষরিক ক্ষেত্রে এই হেফাযতের একটি মহৎ কাজ নিয়েছিলেন আল্লাহ্‌তাআলা হযরত উসমানের কাছ থেকে। এটা ছিল তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র এক বিশেষ ফযল, অনন্য সাধারণ অনুগ্রহ। অথচ, তাঁর এই পবিত্র কাজের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারণা চালিয়েছিল মুনাফিকরা, ইসলামের শত্রুরা। যখন তিনি খলীফা হন তখন তিনি ছিলেন সারা আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। তখন তাঁর যত সংখ্যক উট-দুম্বা ও ভেড়া-বকরীর পাল ছিল, ততটা আর কারোরই ছিল না। কিন্তু তিনি যেদিন শহীদ হলেন, সেদিন দেখা গেল, তাঁর একটি উটও নেই, একটি ছাগলও নেই। আছে শুধু যাত্রার জন্য আলাদা করা মাত্র দু'টি উট।

প্রায় সারাটা ইসলামী জাহানে, এমনকি খোদ দার-উল-খেলাফতেও চক্রান্তকারীরা মুনাফিকরা বিদ্বেষের বহ্নি ছড়ালেও, লক্ষ্যণীয় যে, কোন বিজিত রাষ্ট্রে সেদিন কোন বিদ্রোহ সংঘটিত হতে পারে নি। এর কারণ, সম্ভবতঃ এটাই ছিল যে, দুষমনরা মনে করেছিল যে, খিলাফত অকার্যকর করা গেলেই ইসলামী সাম্রাজ্য এমনিতেই ভেঙে পড়বে, খান খান হয়ে যাবে। তাই, তারা দাবী তুলেছিল যে, উসমানকে খিলাফত ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু, তাদের সেই ঘৃণ্য অপবিত্র দাবীটার কাছে মাথা নত করেন নি খোদার খলীফা, বলেছিলেন ঃ খিলাফত এর যে পোষাক খোদা আমাকে পরিয়েছেন, আমি তা স্বহস্তে খুলে ফেলতে পারি না।

হযরত আলী (রাঃ) খলীফা হন হিজরী ৩৫/৬৫৬ খৃঃ। 'আলী-ই খিলাফতের প্রকৃত হকদার'- এই আওয়াজটা তুলেই ইবনে সাবা যেহেতু বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল, সেহেতু সে এবং তার দলের লোকেরাই প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিল হযরত আলীর নির্বাচনের ব্যাপারে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত উসমান (রাঃ) অস্ত্র ধারণ করেন নি। বরং তিনি এই সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, যদি তোমরা একবার তরবারি উঠাও আমার বিরুদ্ধে তাহলে বিভেদের যে কপাট তোমরা খুলে দিবে মুসলমানদের মধ্যে, তা আর কোনদিন বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু, ইবনে সাবারা আবারও নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকলো। আবারও একবার মুসলমানরা তাদের প্রতারণা ও মিথ্যাচারিতার শিকারে পরিণত হলো। আওয়াজ তোলা হলো, 'উসমানের হত্যাকারীদের বিচার চাই।' এই আওয়াজের অন্তরালে যে ভাবাবেগ ছিল, তার প্রচন্ড আঘাতে মুসলিম উম্মাহ্ দৃশ্যতঃ দ্বিধাবিভক্ত, বিব্রত ছিলেন হযরত উসমান। এবারে তাঁরই রক্তে ভেজা পিরহানের পতাকা তুলে সেই বিভক্তিটাকেই স্পষ্ট করে তুললো মুনাফিকরা শত্রুরা। ভাবাবেগের তাড়না দমাতে পারলেন না অনেকেই এমন কি তালহা জুবায়ের ও (রাঃ)। (চলবে)

- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৩৫তম কিস্তি)

পাপ ক্ষমার অতি সুন্দর একটি দোয়া

□ হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আমার পাপ অশেষ ও অগণিত। তিনি (সঃ) তাকে তিন বার এ দোয়া পুনরাবৃত্তি করালেন আর বল্লেন, এখন উঠো, আল্লাহ্তাআলা তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰى مِنْ عَمَلِيْ-

(مستدرک حاکم مطبوعہ بیروت جلد ا صفحہ ۷۲۸)

(আল্লাহুম্মা মাগফিরাতুকা আও'সাউ মিন যুনূবী ওয়া রহমাতুকা আরজা মিন 'আমালী- মুস্তাদরাক হাকিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭২৮, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার ক্ষমা আমার পাপের চেয়ে অধিক বিস্তৃত নয় কি? আর আমি নিজের কর্মের তুলনায় তোমার কৃপার ওপরেই অধিক প্রত্যাশা রাখি।

করুণা ও ক্ষমার দোয়া

□ হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া বর্ণনা করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى-

(بخاری کتاب المغازی)

(আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী- ওয়ার হামনী-ওয়াল হিক্বনী বির্‌রফীক্বিল আ'লা- বুখারী কিতাবুল মাগাযী)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি কৃপা কর, আর আমাকে উত্তম বন্ধু (অর্থাৎ তোমার সত্তা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

টীকা ঃ কোন কোন বর্ণনা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দোয়ার শেষ অংশে বার বার বলতে ছিলেন- **ইলার্‌রফীক্বিল আ'লা** - নিজের উত্তম বন্ধুর দিকে যাচ্ছি)।

ক্ষমার দোয়া

□ হযরত আমর বিন শুয়াইব (রাঃ) তার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। হযরত জিব্‌রাঈল আকাশ থেকে এ দোয়া নিয়ে অবতীর্ণ হন। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। তিনি এসে নিবেদন করলেন! হে মুহাম্মদ (সঃ)। আল্লাহ্তাআলা একটি উপহার দিয়ে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন অর্থাৎ আরশের এ ধন ভান্ডার এ দোয়ার আকারে আল্লাহ্তাআলা আপনাকে দান করেছেন ঃ

يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيْحَ ،يَا مَنْ لَّا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيْرَةِ وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ ،يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ ،يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوٰى ، يَا مُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى ، يَا كَرِيْمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيْمَ الْمَنِّ ،يَا مُبْتَدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اِسْتِحْقَاقِهَا، يَا رَبَّنَا وَ يَا سَيِّدَنَا وَ يَا مَوْلَانَا ،وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا ،اَسْاَلُكَ يَا اَللّٰهُ اَنْ لَا تَشْوِيَ خَلْقِي بِالنَّارِ-

(مستدرک حاکم کتاب الدعاء مطبوعہ بیروت جلد ا صفحہ ۵۴۵)

(ইয়ামান আযহারাল জামীলা ওয়া সাতারাল-ক্বীহা- ইয়া মাল্লা ইউয়্যাখিযু বিল জারীরাতি ওয়ালা ইয়াহ্তিকুস্‌সিতরা-ইয়া হাসানাত্তাযাউযি ইয়া ওয়াসি'আল মাগফিরাতি-ইয়া বাসিত্বল ইয়াদায়নি বির্‌রহমাতি-ইয়া সাহীবা কুল্লি নাজওয়া-ইয়া মুনতাহা কুল্লি শাকওয়া-ইয়া কারীমাস্ সাফ্হি ইয়া আযীমাল মান্নিইয়ামুবতাদিয়ান্নি আমি ক্বলা ইসতিহ্ক্বাক্বিহা-ইয়া রব্বনা ওয়া ইয়া সায়্যিদনা ওয়া ইয়া মাওলানা-ওয়া ইয়া গায়াতা রগবাতিনা-আসয়ালুকা ইয়া আল্লাহু আল্লা তাশ্‌বিয়া খলক্বী বিন্নারি - মুস্তাদরাক হাকিম, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত, বৈরুত মুদ্রিত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৫)।

অর্থ ঃ ওহে সৌন্দর্য প্রকাশকারী ও অসুন্দরকে আচ্ছাদনকারী সত্তা। ওহে পাপকে উপেক্ষাকারী ও পর্দা উম্মোচন করো না এমন (পবিত্র) সত্তা! ওহে সুন্দর এবং ক্ষমাকারী, ওহে ব্যাপক ক্ষমাকারী! ওহে কৃপার হস্ত প্রসারকারী! ওহে প্রত্যেক কুৎসা ও গোপন পরামর্শকারীর সাথী! ওহে যার নিকট চূড়ান্ত অভিযোগ পৌছে সেই সত্তা! ওহে মহান ক্ষমাকারী! ওহে মহান উপকারী। ওহে পুরস্কার লাভকারীতে পরিণত হওয়ার পূর্বে এর সূচনাকারী। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! হে আমাদের পরিচালক! হে আমাদের অভিভাবক ও আমাদের আশা-উদ্দীপনার শেষ! হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি যেন আমার সত্তাকে আগুনে না ঝলসানো হয়।

অমঙ্গল থেকে সুরক্ষার দোয়া

□ হযরত ইমরান (রাঃ) বিন হাসীন বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমার পিতা যখন মুশরিক ছিলেন, তখন তাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মুসলমান হলে দু'টি অতি কল্যাণজনক দোয়া তোমাকে শিখিয়ে দেবো। আমার পিতা মুসলমান হয়ে হুযূর (সঃ)-কে এ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে হুযূর (সঃ)-এ দোয়া শিখিয়ে দেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ ،وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ-

(ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা আল্ হিমনী রুশদী-ওয়া আ'ইযনী মিন শার্‌রি নাফসী - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! সঠিক পথের হেদায়াতের কথা আমার প্রাণে জাগরিত কর আর আমাকে আমার কু-প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা কর।

□ হযরত শেকাল (রাঃ) বিন হামীদ বলেন, আমি রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করি, আমাদেরকে অসৎকর্ম থেকে সুরক্ষার জন্যে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন। তিনি (সঃ) আমার হাতের তালু ধরে এ দোয়া পড়ার জন্যে হেদায়াত দেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ ،وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ ،وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ ،وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ-

(ابوداؤد کتاب الصلوۃ)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শার্‌রি সাম'ই-ওয়া মিন শার্‌রি বাসারী - ওয়া মিন শার্‌রি লিসানী-ওয়া মিন শার্‌রি ক্বলবী ওয়া মিন শার্‌রি হান্নী - আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের অমঙ্গল থেকে আর হৃদয় ও জিহ্বার অমঙ্গল থেকে এবং নিজের লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

এস হাদীস শিখি

(১১ম কিস্তি)

(৪০) লজ্জা-শরম

اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

(আল্ হায়াউ খয়রুন কুল্লুহু-বুখারী)

অর্থ ঃ লজ্জা-শরম সর্বৈব কল্যাণকর।

ব্যাখ্যা ঃ লজ্জাও ঈমানের একটি অঙ্গ। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমান। নির্লজ্জ ব্যক্তি করতে পারে না এমন কাজ নেই। মানুষ যখন লজ্জাহীন হয় তখন সে মানুষকে ভয় বা সমীহ করে না আর আল্লাহ্কে ভয় করার কথাতো দূরের বিষয়। সে পোষাক পরে থাকলেও সে নগ্ন। কেননা, **লিবাসুত্তাক্ওয়া খায়ের** অর্থাৎ খোদা-ভীতির পোষাক উত্তম। তাকওয়ার পোষাক না থাকার কারণে লজ্জাহীন ব্যক্তি নগ্ন এবং সে কোন পাপ করতেই দ্বিধা করে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সমীহ্ বা ভয় করে চলে সে-ই প্রকৃত লজ্জাশীল। আর এ লজ্জা সবদিক থেকেই কল্যাণজনক।

আল্লাহ্তাআলা সূরা আল্ আনকাবূতে বলেছেন- **ইন্নাস্ সালাতা তানহা 'আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার** অর্থাৎ নিশ্চয় নামায লজ্জাহীনতা ও অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখে। মানুষ যখন সঠিকভাবে নামায পড়ে তখন সে খোদাতাআলাকে সর্বদা চোখের সামনে দেখতে পায় বা কমপক্ষে খোদাতাআলা তাকে দেখছেনঃ এটা সে উপলব্ধি করে। তাই সে পাপ করতে লজ্জা বোধ করে থাকে। এ কারণেই নামায মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু কোন নামাযী পাপ থেকে বিরত না থাকলে তার নামাযে যে ফল হয় নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাক্ওয়ার পোষাকে আবৃত হয়ে আমরা আমাদের মাঝে যেন লজ্জাবোধ জাগ্রত করি তাহলে আমরা পাপ করা থেকে সুরক্ষা পাবো আর এভাবেই লজ্জা শরম আমাদের জন্যে হবে সর্বৈব কল্যাণকর।

(৪১) পুণ্য কাজের আগিদ

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

(আদ্দালু 'আলাল খয়রি কাফা'ইলিহী)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি পুণ্য কাজ করার জন্যে তাগিদ দেয় সে পুণ্যকাজ সম্পাদনকারীর ন্যায় পুরস্কার পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি পুণ্য কাজ করার তাগিদ দেয় সে নিজেও অবশ্যই পুণ্য কাজ করে থাকে নইলে তার পুণ্য করার তাগিদ দেয়ার অধিকারই জন্মায় না। আর তার কথায় কোন প্রভাবও সৃষ্টি হয় না। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পুণ্য কাজের আদেশ দাতাকে পুরস্কারের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা কেবল ব্যক্তিকে স্বার্থপর হতে বলে নি। কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে আদেশ দেয় নি। ব্যক্তি যেন তার চার পার্শ্বের লোকদেরকেও ভাল কাজের তাগিদ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার তাগিদ দেয়। একজন মুসলমানের ওপরে আর একজন মুসলমানের এটা বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। কুরআন করীমের সূরা আলে ইমরানের ১০৫ আয়াতে বলা হয়েছে- 'আর তোমাদের মাঝে (সদা) এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে ও অসঙ্গত কাজ থেকে নিষেধ করবে।' অন্য আরও হাদীসে এ ধরনের তাগিদ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একটি হাদীস এরূপঃ তোমরা যদি খারাপ কিছু দেখ তাহলে তা নিজ হাতে বিদূরিত করো, নিজ হাতে না পারলে নিজ জিহ্বা দিয়ে একে মন্দ কাজ বলে নিষেধ করো, এরও যদি শক্তি-সামর্থ্য না থাকে তাহলে মনে মনে একে ঘৃণা, করো ও দোয়া করো, এরূপ করা বিশ্বাসের সবচে' নীচু স্তর (মুসলিম)।

(৪২) মু'মিনের প্রতিশ্রুতি

عِدَةُ الْمُؤْمِنِ كَاَخْذِ الْكَفِّ

('ইদাতুল মুমিনি কা আখযিল কাফ্ফি)

অর্থ ঃ মু'মিনের প্রতিশ্রুতি এমন নিশ্চিৎ যেমন কোন জিনিষ নগদ দেয়া হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- **ইন্নাল আহ্দা কানা মাসউলা** (সূরা বনী ইসরাঈল - ৩৫) অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে মু'মিনের প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে বলেছেন যে তা যেন নগদ পাওয়ার বস্তু অর্থাৎ মু'মিন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতেই পারে না। নবী করীম (সঃ)-এর জীবনে আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের একটি ঘটনাও পাই না। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে তিনি (সঃ) এক স্থানে ৩ দিন অবস্থান করেছিলেন।

আজকাল দেখা যায় এর উল্টোটা। লেন-দেন কথা-বার্তায় আজকাল এটা যেন নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করার প্রয়োজন নেই। এটা যেন কথা ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ জীবনে প্রতিশ্রুতি পালন খুবই জরুরী। আমরা যারা বর্তমান যুগের মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর হাতে বয়াত করেছি আমাদের সর্বদা প্রতিশ্রুতি পালনে যত্নবান হওয়া আবশ্যক; সে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ রসূল বা অন্য যে কারও সাথেই করি না কেন।

(৪৩) পারস্পরিক সন্ধি

لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ

(লাইয়াহিল্লু লিমু'মিনি আঁইয়াহ্জুরা আখাহূ ফাওকা সালাসাতি আইয়্যাম - বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ ঃ কোন মু'মিনের জন্যে তার কোন মু'মিন ভাইয়ের সাথে ৩ দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ নয়।

ব্যাখ্যা ঃ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। ঈমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্ক রচিত। এ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন ও অক্ষত রাখার জন্যে কুরআন ও হাদীসে অনেক উপদেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমান হাদীসও এর অন্যতম। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী মু'মিনরা সীসাগলিত প্রাচীরের ন্যায়। কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি তাদের মাঝে যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্যে সদা দৃষ্টি রাখার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসটিতে সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন মু'মিন মুসলমান যেন ৩ দিনের বেশি কোন মু'মিন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না রাখে সে জন্যে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। মানবিক দুর্বলতার কারণে এক মু'মিনের সাথে আরেক মু'মিনের মতভেদ ও সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু তা যেন ৩ দিনের অধিক স্থায়ী না হয়। ৩ দিনের মধ্যে উভয়ের রাগ-বিরাগ মান-অভিমানের সমাপ্তি ঘটা উচিত। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর মহামূল্যবান পুস্তক কিশতিয়ে নূহ-তে বলেছেন ঃ "যতশীঘ্র

সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল ও নিজ ভাইকে ক্ষমা কর; কারণ যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয় সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যাবে।' তিনি আবার বলেন, 'তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজ ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে হঠকারিতা করে ও নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়।"

(৪৪) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ

(লা ইয়াশকুরুল্লাহা মাল্লা ইয়াশকুরুন্নাসা)

অর্থ ঃ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা করে না সে আল্লাহ্‌রও কৃতজ্ঞতা করে না।

ব্যাখ্যা ঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা একটি মহৎ গুণ। প্রত্যেক মানুষ চায় তার কৃতজ্ঞতা যেন স্বীকার করা হয় তার অকৃতজ্ঞতা যেন না করা হয়। এ হাদীসে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কৃতজ্ঞতার গুণকে সঞ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। যদিও কৃতজ্ঞতা লাভের সবচে' বেশি হকদার হলেন আল্লাহ্‌তাআলা তথাপি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা এজন্যে দেয়া হয়েছে যেন মানুষের মাঝে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আত্মা বিনষ্ট না হয়। তাই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা করে না সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা করে না অর্থাৎ মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করতে করতে এ মহৎ গুণটি থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ্‌তাআলা কৃতজ্ঞতাকে জাগরূক রাখার জন্যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ দিয়েছেন। কুরআন করীম এ প্রসঙ্গে বলেছে ঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হয়ে চল্লে নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেবো আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে (জেনে রেখো) আমার আযাব বড়ই কঠোর' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭)

সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার বেশি বেশি নেয়ামত লাভ করতে হলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে। আর এ কৃতজ্ঞ হওয়ার অভ্যাসকে সমুন্নত রাখতে হলে মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন। (চলবে)

- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সময়ের দাবী ঃ ঐক্যবদ্ধ

এপ্রিল, ২০০৩ মাসিক মদীনা পত্রিকার একটি প্রবন্ধে 'সময়ের দাবী ও ঐক্যবদ্ধ' নামে একটি লিখা পাঠ করলাম। লেখক বড়ই দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, "বড় অনুতাপের বিষয় মুসলমানদের মাঝে আজ ঐক্য ও সংহতি নেই। নেই পরস্পর সহযোগিতা। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যাচ্ছে বৈরী শক্তিগুলো। হযরত রসূল করীম (সঃ) আল্লাহ্‌র দেয়া একমাত্র সার্বজনীন জীবন বিধান, তথা কুরআনের হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাত্র তেইশ বছর মেহনতের বদৌলতে গড়ে তুলেছিলেন এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের বিশাল জামায়াত। তারা সকলেই ছিলেন কুরআন সুন্নাহ্ সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত নিবেদিত প্রাণ। তারা ছিলেন হেদায়েতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এজন্যেই তাদের এত সফলতা। কিন্তু আমাদের কুরআন সুন্নাহ্‌র প্রতি ঐক্য না থাকার কারণে ইহুদী ও নাসারাদের হাতে দফায় দফায় মার খেতে হচ্ছে। যা কোনক্রমে মেনে নেয়া যায় না। আজ বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যদি ঐক্য ও সংহতি থাকত, তাহলে রাবনের গোষ্ঠী মুসলমানদের একটি লোমেও টোকা দিতে সাহস পেত না। এ ক্ষেত্রে রসূল করীম (সঃ) এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন হচ্ছে। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল, তেমনিভাবে আমার উম্মত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। একটি জামায়াত ব্যতীত সকল ফিরকাই জাহান্নামী হবে। সাহাবাগণ (রাঃ) প্রশ্ন করলেন সেই জামাত কোন্‌টি? নবী করীম (সঃ) বলেছেন আমি এবং আমার সাহাবাগণের তরীকায় যারা থাকবে (তিরমিযী ও মিশকাত-৩০)"।

প্রশ্ন এই যে, বর্তমান যুগে শিয়া, সুন্নী, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, বেরেলবী, দেওবন্দী, আহলে হাদীস, ওহাবী, মুতাজিলা ইত্যাদি তেহাত্তরটি দলের মাঝে কোন দলটি সাহাবাগণের তরিকায় আছে এবং সাহাবাগণের তরীকাই বা কি ছিল এ বিষয়ে নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম-ওলামা মুফতী মাওলানাগণ একটু ভেবে চিন্তে দেখবেন কি?

অতঃপর লেখক বলেছেন, "অশুভ শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমরাও কি আল্লাহ্‌র পথে একতাবদ্ধ হতে পারি না? প্রত্যেক মুসলমান তো একে অপরের ভাই। যতদিন মুসলমানগণ সীসা গলা প্রাচীরের মত একতাবদ্ধ হবে না; ততদিন পর্যন্ত পরাজয়ের গ্লানী আসতেই থাকবে।"। এ প্রসঙ্গে রসূল (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে বলেন, "আমার উম্মতের উপর এমন একটি দুঃসময় আসবে, যখন দুনিয়ার তাবৎ বৈরী শক্তিগুলো পরস্পর যোগ-সাজশ করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; যেমন করে দাওয়াতের মজলিশ সাজিয়ে একে অন্যকে ডেকে ডেকে খাওয়ার পর্ব শুরু করে। একজন সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)! আমরা কি তখন সংখ্যায় নগণ্য হবো? রসূল (সঃ) বললেন, বরং তোমরা সংখ্যায় বিপুল থাকবে। কিন্তু প্রাণের মায়া ও পার্থিব ভোগ বিলাসের মোহ তোমাদিগকে একেবারে অনুভূতিহীন জড় পদার্থের মত করে ফেলবে। দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র দীন কায়েম করতে আমাদেরকে দৃঢ় মনোবল সৃষ্টির পদক্ষেপ নিতে হবে। মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন না হওয়ার জন্য আল্লাহ্ হুঁশিয়ারী সংকেত দিয়ে বলেন, তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (দীনকে) সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (৩ঃ১০৩)। মহান আল্লাহ্ সমাজে দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দলা-দলী ও মতভেদে লিপ্ত না হয়ে, ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তোমরা (তোমাদের সমাজে) দীন (জীবন ব্যবস্থা) কায়েম কর। আর এ ব্যাপারে দলাদলী ও মতভেদে লিপ্ত হয়ো না। কাজেই আমাদেরকে সর্বক্ষণ ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে; এ কারণে যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলামকে টিকে রাখার জন্য"।

প্রশ্ন এই যে, একতাবদ্ধ থাকতে হলে কোন একজন নেতার প্রয়োজন নয় কি? বাহ্যিক জগতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেক দলের জন্য, প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন নেতা থাকে। নেতা ব্যতীত নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। ইসলাম বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইসলামের অনুসারী মুসলমান জাতির একতা, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি বজায় রেখে নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে চলার জন্য কি কোন নেতার আবশ্যকতা নেই? আল্লাহ্

এবং বিশ্বনবী হযরত রসূল করীম (সঃ) কি এ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি? পাক কালামে আল্লাহ্ -তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তাহলে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র আনুগত্য কর রসূলের এবং যিনি তোমাদের মাঝে আদেশ দেয়ার অধিকারী তাঁকেও" (সূরা নেসা)।

বুঝা গেল আল্লাহ্কে মানতে হবে, রসূলকে মানতে হবে এবং যিনি আদেশ দেয়ার অধিকারী তাঁকেও মানতে হবে। আদেশ দেয়ার অধিকারী বুঝাতে জাগতিক দিক দিয়ে শাসন কর্তাকে বুঝায় এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যুগ-ইমামকে বুঝায়। যুগ-ইমাম নবী না হলেও একজন মানুষ যেভাবে নবীকে মান্য করে চলে একইভাবে যুগ-ইমামকে মেনে চলতে হবে।

তাই হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যমানার ইমামকে না মেনে মৃত্যু লাভ করবে তার মৃত্যু জাহিলিয়তের" (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) প্রশ্ন এই যে, বর্তমানকালে মুসলমান জাতির ইমাম বা নেতা কে? এবং তিনি কোথায় নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ তার কোন খবর রাখেন কি? হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের কাছে দু'টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না এবং তা হলো আল্লাহ্র কুরআন এবং রসূলের সুন্নত"।

মুসলমানগণ আল্লাহ্র এ কুরআন পাঠ করে মুখস্থ করে লম্বা জুব্বা জামা আসকান পায়জামা লম্বা দাড়ি লম্বা টুপি পরিধান করে রসূলের সুন্নত পালনের গর্বে বুক স্ফীত করে চলে তবুও তাদের অধঃপতন হবে কেন? আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সঃ)-এর নির্দেশনাবলীকে অমান্য অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার কারণে নয় কি?

আল্লাহ্তাআলার রজ্জুটা কী? যার মাধ্যমে মুসলমান জাতির একতা ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি সীসাগলা প্রাচীরের মতো হবে? নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের কথা পঞ্চমুখে বর্ণনা করে থাকেন, কিন্তু একটু হৃদয়ঙ্গম করে দেখেন না যে, তাঁদের আদর্শ তরীকাটা কী ছিল যার মাধ্যমে সীসাগলা প্রাচীরের মত সাহাবা (রাঃ)-গণ একতাবদ্ধ হয়ে চলেছিল?

নামধারী নায়েব রসূলগণ তাদের মনগড়া অর্থে রজ্জুকে কেউ বলেন দীন, আবার কেউবা বলেন কুরআন। দীন এবং কুরআন তো বটেই কিন্তু এর মানে এ নয় যে, পবিত্র কুরআন মজীদকে শুধু মৌখিকভাবে পাঠ করতঃ গিলাফে জড়িয়ে সাত বার চুমু খেয়ে তাকে তুলে রাখা। বরং তার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতঃ আল্লাহ্তাআলার নির্দেশাবলীকে মেনে চলাই একজন ঈমানদার মু'মিন এর লক্ষণ। 'রজ্জু' অর্থ সূরা নূর এ বর্ণিত খিলাফত। যার মাধ্যমে মুসলমানগণের একতা ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি মজবুত থাকবে। সাহাবা (রাঃ)-গণ আল্লাহ্র খিলাফতের প্রতি দৃঢ় ঈমান রেখে খলীফার অধীনে পরস্পর ভাই ভাইরূপে প্রাণঢালা মহব্বতের সেই 'রজ্জুর' বাঁধনে সীসাগলা প্রাচীরের মতো একতা বদ্ধভাবে চলেছিলো। তাই তাদের উপর মহান আল্লাহ্তাআলার কৃপাহস্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং তারা একমাত্র ঈমানের বলে শত্রুগণের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মুসলমানগণের জয়ী হওয়ার শর্ত সম্পর্কে লেখক এক জায়গায় বলেছেন, "সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানগণ অমুসলমানগণের উপর তখনই বিজয়ী হতে পারবে, যখন তারা খাঁটি ইমানদার ও মুমীনের মর্যাদা লাভ করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ সাত নম্বর পারার চতুর্থ রুকুতে বলেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা যদি ঈমানের উপর দৃঢ়পদ থাক, তবে কোন অপশক্তি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না (আল্ কুরআন)"। আমাদের ঈমানী শক্তি প্রবল রাখতে হবে। যালিমের সাথে মিশে যালিম হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ হুঁশিয়ারী করে সূরাতুল কাসাস-এর এক আয়াতের উল্লেখ করেন, "আমি (আল্লাহ্পাক) কোন জনপদকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার অধিবাসীরা যালিমে পরিবর্তন হয়"। এ ব্যাপারে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে মুমীন হওয়া পূর্ব শর্ত। যার প্রমাণ আল্লাহ্ পাক দেন, "তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত হইওনা, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইওনা। তোমরাই প্রবল থাকবে যদি তোমরা মোমেন রূপে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পার" (আল কুরআন)। যেহেতু আল্লাহ্র বাণী অবশ্যই অব্যর্থ সেহেতু জয় সুনিশ্চিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "ইহা এমন একটি বাণী যা মিথ্যা রচনা নহে। এখন আমাদের কুরআন হাদীসের বিধি-বিধান মত চলতে হবে, যাতে ঈমানদার ও মুমিনের মর্যাদা লাভ করা যায়। মুসলমান যখন সৎ নিয়ত নিয়ে দাঁড়ায় তখন মহান আল্লাহ্র মদদ নেমে আসে। বর্তমানে মহান সংকটেও আমরা আল্লাহ্র মদদ থেকে বঞ্চিত হব না।"

প্রশ্ন এই যে, মুসলমানগণ নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জব্রত পালন করে তবুও তারা শত্রুদের হাতে মার খাচ্ছে কেন? লাঞ্ছিত অপমানিত পদদলিত কেন হচ্ছে? আল্লাহ্তাআলার মদদ কেন তাদের উপর নেমে আসছে না ঈমানদার মু'মিনের মর্যাদা লাভ না করতে পারার কারণে নয় কি?

ইসলামকে টিকিয়ে রাখার চিন্তা-ভাবনা করার কারো প্রয়োজন নেই। ইসলামের অনুসারী মুসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার মু'মিন কিনা সে বিষয়ে নিজেরা চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। ইসলাম যেমন আল্লাহ্তাআলার মনোনীত ধর্ম তেমনি এর রক্ষা-কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা শর্ত বিচ্ছিন্ন নেতাবিহীন ঈমানহীন অধঃপতিত মুসলমান জাতির এই অবস্থায় আল্লাহ্তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমান মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে আহমদীয়া জামাত নামে এক ঐশী সংগঠন স্থাপন করতঃ বহুধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে ঐক্যের ডাক দিলেন। যতদিন পর্যন্ত মুসলমান জাতি আল্লাহ্র প্রেরিত হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনয়ন করত সীসাগলা প্রাচীরের মত পরস্পর ভাই-ভাইরূপে প্রাণঢালা মহব্বতে আল্লাহ্র রজ্জুর বাঁধনে একতাবদ্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমান জাতি শত্রুগণ কর্তৃক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতেই থাকবে। আল্লাহ্তাআলার বিধি-বিধান অমান্য ও অস্বীকার করার কারণেই মুসলমান জাতির ললাটে নেমে এসেছে অমানিশার ঘন ঘোর অন্ধকার।

বর্তমান যুগে একমাত্র আহমদী জামাতই খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় আল্লাহ্র খিলাফতের প্রতি দৃঢ় ঈমান রেখে খলীফার অধীনে পরস্পর ভাই-ভাই রূপে হৃদয় নিংড়ান মহব্বতের সেই আল্লাহ্র 'রজ্জুর' বাঁধনে সীসা গলা প্রাচীরের মত একতাবদ্ধভাবে ইসলামের মহানবাণী প্রচার ও প্রসারকল্পে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে আছে যাদের কোন তুলনা নেই। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর বর্ণিত তেহাত্তরটি দলের মাঝে বাহাত্তরটি দলই একযোগে আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে চরমভাবে উঠে পড়ে লেগে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, আহমদী জামাতই হযরত রসূল করীম (সঃ) বর্ণিত জান্নাতী সেই একটি দল যাঁরা সাহাবা (রাঃ)-গণের তরীকায় আছে।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

সত্য চাপা থাকে না

দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদকীয় মন্তব্য ঃ সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ১৮৮৯ইং সালের ২৩শে মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি প্রগতিশীল ও বিকাশমান ঐশী আন্দোলন। বর্তমানে ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন ১৭৬টিরও অধিক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করেছেন। ইসলামের সকল প্রচার কার্যক্রম ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের দ্বারা বিশ্বময় সুচারুরূপে ক্ষিপ্রগতিতে চলছে। তাই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ আহমদীদের সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাঁধা সৃষ্টি করছে। দৈনিক প্রথম আলো গত ৫/১/০৩ইং সংখ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোকিত সম্পাদকীয় প্রকাশ করে মহল বিশেষ এজন্য ক্ষুব্ধ।

উগ্রবাদী কট্টরপন্থী মৌলবাদীরা ক্রোধের বহ্নি শিখায় উন্মত্ত হয়ে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে। এবং উন্মাদনা-উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়ে বলপূর্বক ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পলি মাটি থেকে উৎখাত করতে নিরন্তর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাঠক নন্দিত দৈনিক প্রথম আলো। 'অমুসলিম ঘোষণার দাবী এ অন্যায় দাবি থেকে বিরত থাকুন' শীর্ষক এই সম্পাদকীয় প্রকাশ করে চার দলীয় জোট সরকার বিরোধী দল ও দেশের সচেতন নাগরিকগণকে যথাসময়ে সতর্ক করে দিয়ে চরম সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেছেন। ইসলামী দর্শনে ধর্ম নিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে যত্নবান হলে জাতি প্রভূত উপকৃত হয়। একটি পাঠক-প্রিয় পত্রিকা ন্যায় ও সত্যকে তুলে ধরে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। দল মত নির্বিশেষে তাদের মতামত বলিষ্ঠভাবে প্রকাশের সুযোগ পেলে এবং কোন সংবাদ পত্র এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলে দেশবাসীর কাছে কোন সত্য আর গোপনীয়তায় আবৃত থাকে না। দেশের সচেতন মানুষ প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার মাধ্যমে অহর্নিশ দেশ-বিদেশে সংঘটিত খবরা-খবর জানতে চায়। প্রতিদিন মানুষ সত্যের মুখোমুখি হয় বটে, তবে সত্য প্রকাশিত হোক এটা কয়জনই বা চায়। এক্ষেত্রে গণমানুষের প্রিয় পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও সত্য প্রকাশে সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করে আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশবাসীকে প্রগতির পথে চলার জন্যে সহায়তা ও অনুপ্রাণিত করতে থাকে। মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করা অন্যায়। কোন সংবাদ পত্র কারো উস্কানীমূলক বক্তৃতা বিবৃতি ছেপে দেশময় উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে পারে না।

ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়া সঠিক কর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে। ধর্মহীনতা নয়। এক কথায় ধর্ম যার যার কিন্তু রাষ্ট্র সকলের। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নীতি গর্হিত কাজ। ধর্মের প্রচার ও প্রসারে যে কেউ নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে সাফল্যের চরম শিখরে উপনীত হতে পারে। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষকে কোন ধর্মকে পসন্দ করে তা গ্রহণ করতে পারে। কোন ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শে বিমুগ্ধ হয়ে তাকে গ্রহণ বরণ নিয়ে তার প্রচারিত ধর্মকে গ্রহণ করে প্রগতির পথে চলতে পারে। এক্ষেত্রে কাউকে বাঁধা দেয়া যাবে না। ধর্ম নির্বাচনের বিষয়টি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও পরিত্রাণের উপর নির্ভর করে। ধর্ম পালনে সবাইকে যত্নবান হতে হবে। তবে ধর্মের নামে রক্তপাত এবং ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা শরীয়ত বিগর্হিত কাজ।

দৈনিক প্রথম আলো লিখেছে, গত ৩ জানুয়ারী শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানে আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজ খতমে নবুওয়ত আয়োজিত সম্মেলনে আহমদীয়া (তথা কাদিয়ানীদের) 'অমুসলিম' ও 'কাফের' ঘোষণার যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে তা একটি অনাবশ্যক ও অন্যায় দাবি। এ ধরনের দাবি সমাজে বিভেদ, বিভ্রান্তি ও ঘৃণা ছড়াবে বলে আমরা মনে করি। কাদিয়ানীদের (আহমদী) অমুসলিম ঘোষণার দাবি এর আগেও উঠেছে। কিন্তু এ দাবির পেছনে কোনো সঙ্গত কারণ নেই। আহমদীয়া নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে আমরা যতদূর জেনেছি তাতে দেখা যায় তারা ইসলাম, কোরআন, হাদিস এবং ইসলামের মূল বাণী মেনে চলেন। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী (সর্বশেষ শরীয়তদাতা নবী) এটিও তারা মানেন। তাহলে কাদিয়ানীদের কাফের বলা হবে কেন? তাছাড়া কাদিয়ানীরা মুসলিম নাকি অমুসলিম তা সরকার কেন নির্ধারণ করবে? কেউ যদি নিজেকে মুসলমান বলেন, তাকে অমুসলিম বলার এখতিয়ার কি সরকারের আছে? ইসলামের জন্মভূমি সৌদি আরবেও রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয় নি। সম্পাদকীয়তে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। আহমদী বা তাদের বিশ্বাস কারো কোন ক্ষতি করেছে বলে আমাদের জানা নেই। কাউকে 'কাফের' বা 'অমুসলিম' ঘোষণায় মাধ্যমে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হোক এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। কাজেই জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিবসহ খতমে নবুওয়ত সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার যে দাবি তুলেছেন। তা গ্রহণযোগ্য নয়। এধরনের দাবি উত্থাপন থেকে সবাইকে নিবৃত্ত থাকার জন্য প্রথম আলো সম্পাদকীয়তে উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। ঐ ৫/০১/০৩ইং

দৈনিক প্রথম আলোর আলোক সঞ্চারী সম্পাদকীয় প্রকাশের পর উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। মওলানা মান্নানের নিয়ন্ত্রিত একটি দৈনিক নিশ্চুপ হয়ে বসে না থেকে উল্টো উস্কানীমূলক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সংবাদ পরিবেশন করে ইসলামে আহমদী আন্দোলনের শান্তিকামী সদস্যদের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দিয়ে অত্যাচার উৎপীড়নের লক্ষ্য বস্তুতে তাদের পরিণত করে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে প্ররোচনা যোগাচ্ছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকল্পে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে (আবির্ভূত) হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হওয়ার দাবীকারক কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদকে সাদরে গ্রহণ বরণ করে নেয়া আহমদী মসলমানদের জন্যে ঐশী আদেশ ছিল এবং তা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা আহমদীরা প্রদর্শন করতে পারে নি। আজ একটি ঐশী আদেশ মেনে নেয়ার কারণেই আহমদীরা উগ্রবাদী কতিপয় সংগঠনের রুদ্র রোষের শিকার হয়েছে। কিন্তু আহমদী জামাত একটি বিকাশমান প্রগতিশীল ঐশী পুনর্জাগরণমূলক ইসলামী আন্দোলন। বিশ্বের ১৭৬টিরও অধিক দেশে আজ আহমদী জামাত বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম ধর্মের সঠিক ও কার্যকরী প্রচার কার্যক্রম ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আহমদীদের প্রচার-পুস্তিকা এবং মুসলিম টেলিভিশন

আহমদীয়া ইসলামের প্রচার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করছে।

দৈনিক ভোরের কাগজে ৩০ কার্তিক সংখ্যায় মওলানা আবুল কালাম-এর আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণা প্রসঙ্গে শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। লেখক স্বতস্ফূর্তভাবে তার নিবন্ধে আহমদী জামাতের দ্বারা ইসলাম প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করে লিখেছেন। আহমদী মুসলমানরা ১৩০টি (বর্তমানে ১৭৬) দেশে ইসলামের প্রচার প্রসার কাজে নিয়োজিত আছে। আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এমনকি এশিয়ারও অনেক দেশে যতো নতুন মসজিদ নির্মিত হচ্ছে, তার প্রায় সবগুলোই আহমদীয়ারা তৈরি করছে। আফ্রিকার উপ-জাতীদের তারাই ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করছে। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মাঝে কাদিয়ানীরাই মহান আল্লাহ্তাআলা ও তাঁর রসূলের বাণী প্রচার করছে। আর আমরা যারা নিজেদের খাঁটি মুসলমান বলে দাবী করছি, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার আবদার করছি, তাদের মসজিদ মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার ও কুরআন হাদীস ইত্যাদি গ্রন্থরাজিতে অগ্নি সংযোগ করছি, তারা নিজেদের মধ্যে দলাদলি, হিংসা-বিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়ানো ছাড়া কিছুই করছি না। আহমদীয়াদের বিশ্বব্যাপী এ তৎপরতায় ইহুদী খৃষ্টান কমিউনিটি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে। তারা উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে তাদের লেজুড়বৃত্তিকারী মুসলিম দেশগুলোকে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্যে চাপ দিতে থাকে। পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও ইহুদী খৃষ্টানদের চাপের নিকট নতি স্বীকার করে। তারা (ভুট্টো ও জিয়াউল হক) আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করে। যারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রক্ষার জন্যে জান-মাল উৎসর্গ করেছিল। তারা পাকিস্তানের অনুকরণে বাংলাদেশেও আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্যে দাবী করছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে গ্রন্থকার শামসুল আলম ইন্টারন্যাশনাল আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে লিখেছেন, 'ইসলামী প্রচার সংস্থাগুলোর প্রাচীন হলো কাদিয়ানী (আহমদী মুসলিম) প্রচার মিশন। ... জ্ঞান বিশ্লেষণের অতি উন্নত মার্গে তারা (আহমদী মুসলমানগণ) বিচরণ করেন। রং ঢং ভড়ং তাদের মোটেই নেই।' (ঐ পৃঃ ১০)। মাসিক আজকের জার্মানী আহমদী জামাত সম্পর্কে লিখেছে, 'প্রধানতঃ আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই জার্মানীতে ধর্ম প্রচারের কাজ চালিয়ে আসছেন এবং তারাই লন্ডন ও প্যারিসের মত বার্লিনেও মসজিদ নির্মাণ করেছেন। কোরআন শরীফ জার্মান এবং ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় তর্জমা করে তাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছেন। তাঁদের এই মিশনারী কাজের সাফল্যের প্রমাণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জার্মানরা। প্রত্রিকাটি আহমদী মসজিদের ১টি ছবি প্রচ্ছদে এবং ১২/১৩/১৪ পৃষ্ঠায় একাধিক মসজিদের ছবি ছেপে এই মন্তব্য করেছে যে, '১৯৫৭ সালে নির্মিত হামবুর্গ বন্দরের প্রান্তবর্তী এই মসজিদটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের স্থাপত্য কীর্তির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন' (ঐ, ঢাকা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ইং ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)।

মাওলানা আবুল কালাম মনে করেন, মাওলানা মওদুদী ও তার দলের আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের পিছনে ধর্মীয় তাগিদ বড় একটা ছিলো না। জামাতী ইসলামীর প্রতি জনমত আকৃষ্ট করার এটা ছিল একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট বিশ্ব মানচিত্রে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু মওদুদী পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতায় কোমর বেঁধে নেমে পড়েন এবং মুসলিম লীগ নেতাদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন। সময়ের ক্রমধারায় ১৯৭১ ইং সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু মওদুদী ও তার দল জামাত বিভক্ত কিংবা অবিভক্ত ভারতের কোন আন্দোলনের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে মওদুদী জামাত ও সমআদর্শভিত্তিক দলগুলো পাক হানাদার কাহিনীর মদদপুষ্ট হয়ে বাংলাদেশে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উদ্ভব করে। জামাতের সৃষ্ট তিনটি সংগঠন এবং পাক বাহিনীর সশস্ত্র যৌথ অভিযানের ফলে এত ধ্বংসযজ্ঞ বিপুল প্রাণহানি রক্তপাত এবং ক্ষয়ক্ষতি এদেশে সংগঠিত হয় যার নজির বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসনাবশান ঘটুক এটা মওদুদী চায় নি। মওদুদী বলেন, ইংরেজ ছ'হাজার মাইল দূর থেকে এসে এদেশ শাসন করছে, ইসলামের সাথে তার কোন দ্বন্দ্ব নেই।" এ ছিল সে সময় মওদুদী ও তার দল জামাতে ইসলামীর ভূমিকা। মাওলানা আবুল কালাম বলেন, ভারত বিভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে তিনি পাকিস্তানে চলে আসতে বাধ্য হন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে আলেমদের একটি সম্মেলনে (করাচীতে) পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে ২২টি মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে তা আট দফায় রূপান্তর করা হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার দাবী পাকিস্তান থেকে প্রথমে করা হয়। একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার আবদ্ধ থাকতে পারে না। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকগণই ধর্ম পালন করে। কিন্তু রাষ্ট্র নয়। ১৯৫৩ সালের ২১ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তান গণপরিষদে শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ পেশ করেন। এ সময় মওদুদী ও অন্যান্য কট্টর পন্থী আলেমদের পক্ষ থেকে তাতে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়। এবং এই সংশোধনী প্রস্তাবে আহমদীয়াদের সংখ্যালঘু গণ্য করার দাবী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাতে করে জামাতের আট দফা দাবীতে আহমদীয়া সম্পর্কিত ধারাটি সংযোজিত হয়ে তা নয় দফায় রূপান্তরিত হয়। প্রাজ্ঞ আলেমগণ মনে করেন এ সময় থেকে আহমদীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবী উঠা শুরু করে। ১৯৫৩ সালের ১৮ জানুয়ারী করাচীতে আহমদীয়া বিরোধী উগ্রপন্থী সর্বদলীয় কনভেনশনের সংগ্রাম কমিটির এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে আহমদীয়া প্রশ্নে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এ সময় "কাদিয়ানী মাসআলা" শীর্ষক মওলানা মওদুদীর একটি বই উর্দূ ও ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রজ্জ্বলিত উনুনে তেল ছিটানোর কাজ করে। পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী রক্ষক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়। সেখানকার রাজপথ নিরীহ জনতার রক্তে লাল হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, লাহোর থেকে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপরাধে মওদুদীকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক আদালতে বিচারক এক রায়ে তার মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়। পরে তা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে রূপান্তরিত করা হয়। অদৃশ্য শক্তির অপতৎপরতার ফলে ২৫ মাস জেল খাটার পরই মওদুদী মুক্তি লাভ করে। (দৈনিক ভোরের কাগজে ৩০ কার্তিক, ১৩৯৯)

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহা পরিচালক মওলানা আবদুল আউয়াল 'এ সব কি ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ দৈনিক আজকের কাগজের ৮ পৌষ ১৪০০ বাংলা

সংখ্যায় লিখেছেন। আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবী পাকিস্তান থেকে আমদানীকৃত বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করেন। আধুনিক শিক্ষিত ভুট্টোর এ পদক্ষেপের এটা রাজনৈতিক পটভূমি ছিল। পাঞ্জাবের নির্বাচন আহমদীয়ারা একটা ফ্যাক্টর। ভুট্টোদের ধারণা ছিল আহমদীরা পিপিপিকে ভোট দেয় না। আর পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই জুলফিকার আলী ভুট্টো আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করে মুসলিম লীগের ভোটার সংখ্যা হ্রাস করেন। আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার পেছনে এছাড়াও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। (প্রাগুক্ত পৃঃ ৫)।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল অনেক আলেম মনে করেন, ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান। এক্ষেত্রে ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে জোর করে কারো উপর চাপিয়ে দেয়া কোন সত্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট আর সত্য থাকে না। সত্যের অন্বেষণ এবং তা অনুসরণের অপরিহার্য শর্ত হলো বিবেকের স্বাধীনতা। এ জন্য ইসলাম কারো বিবেকের উপর হস্তক্ষেপ করে না। খাতামান্নাবীঈন সংক্রান্ত আয়াতের মর্মার্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। যারা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে তাদেরকে যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে বুঝাতে হবে।

ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েও কারো পদস্খলন ঘটতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার ক্ষমতায় চিরস্থায়ীভাবে কেউ সমাসীন থাকে না। অনেক রাজনীতিক নেতা আলেম এটা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে না। আহমদী মুসলমানরা কোন রাজনীতি দলের লেজুরবৃত্তি করে না। তাদের মাঝে দেশ-প্রেম অতি প্রবল। দেশের জনগণকে তারা ভালবাসে।

হযরত ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবীকারক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেছেন, 'আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। এ জামাত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও কুরআন মজীদের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি।' (লেকচার লুধিয়ানা পৃঃ ১২, মলফূযাত ৮ম খন্ড পৃঃ ২২৪-২২৫)।

মহানবী (সঃ) বলেছেন যে আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলা মুখী হয়ে এবং আমাদের জবাই করা প্রাণীর মাংস খায় সে-ই মুসলমান। তার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র দায়িত্বে তোমরা হস্তক্ষেপ করো না" (বুখারী)। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "মানুষের মাঝে যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে তাকে আমার জন্য তালিকাভুক্ত করে নাও" (বুখারী)। মওলানা আউয়াল বলেছেন, 'এই হাদীস দু'টি অত্যন্ত স্পষ্ট। কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আলেম সমাজ হচ্ছে মহানবীর (সঃ)-এর উত্তরাধিকারী। তিনি মানব জাতিকে ন্যায় ও সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। ন্যায় ও সত্য গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কাউকে অমুসলিম সার্টিফিকেট দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন নি। মহানবী (সঃ) উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর এ আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার-সম্প্রচারের দায়িত্বই আলেম সমাজের উপর বর্তায়। এর বাইরে নয়। নবী করীম (সঃ)-এর আদেশ লংঘন করে নৈতিকতাবর্জিত ও শরীয়ত গর্হিত কাজ করা কারো জন্য উচিত হবে না"।

মহানবী (সঃ) নিজেই বলেছেন, "হযরত মূসার উম্মতে বাহাত্তর ফেরকা ছিল। আমার উম্মতে তিহাত্তর ফেরকা হবে। মত বিরোধের কারণে বনী ইসরাঈলগণ ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অনুরূপ উম্মতে মুহাম্মাদীয়াও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতে যত দল উপদল ছিলো, নবী করীম (সাঃ)-এর উম্মতে তার চেয়েও বেশি হবে। এসব ফেরকা বা দলের একটি ছাড়া বাকী সবগুলোই বাতিল ফেরকা বলে গণ্য হবে এবং নরকবাসী হবে। মহানবী (সঃ) এসব বাতিল ফেরকাকেও তাঁর উম্মত বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও বলেন নি যে, ৭২ ফেরকার লোকেরা আল্লাহ্র এবং রসূলের নাম নিতে পারবে না। পবিত্র কুরআন মজীদ পাঠ করতে পারবে না, মসজিদে নামায পড়তে পারবে না এমনকি আরবী ভাষাও ব্যবহার করতে পারবে না। মহানবী (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কোন মানুষের প্রতি এসব বাধ্যবাধ্যকতা আরোপ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন বিধি-বিধানও জারি করেন নি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ জঘন্য উক্তি ও ঘৃণাব্যাঞ্জক অশোভন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য মহল বিশেষকে সতর্ক থাকতে হবে। নতুবা কেউই ঐশী আঘাত থেকে রেহাই পাবেন না। আহমদী জামাতই মুক্তিপ্রাপ্তদের জামাত। এ আন্দোলন স্বয়ং হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) কায়েম করেছেন। খোদাতাআলার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষকে কর্তন করার বৃথা চেষ্টা করা অন্যায় হবে। আমরা সকলের চেতনার সংশোধনী কামনা করি এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব সকল নাগরিকের। দেশের ভাবমূর্তি যাতে উজ্জ্বল হয় সে চেষ্টা করতে হবে। দেশের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত রুখতে হবে। বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্র। আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ হতে হবে। কোনভাবেই সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদে সবাইকে একই মোহনায় মিলিত হতে হবে। আমরা দেশবাসীর ঐক্য কামনা করি। মহানবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা কল্পে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছেন। কাজেই ইমাম মাহ্দী (আঃ) এবং তাঁর জামাতের মাধ্যমেই বিশ্ববাসী একই মোহনায় মিলিত হবে। আহমদীয়া জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) কাদিয়ানে ১৯৯১ইং সালের ডিসেম্বর মাসে সালানা জলসায় ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদকে রক্তাক্ত পথ পরিহার করতে আহ্বান জানান। তিনি সম্মেলনে বলেন, 'প্রথমে তোমরা মানুষ হও, তারপর ধর্মের কথা বল' বাংলাদেশ কোনক্রমেই যাতে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য না হয়, সেজন্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়াতে হবে। মতবিরোধও মতানৈক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা জাতীয় ঐক্য কামনা করি। সকল বৈরিতা ও মতবিরোধের অবসান ঘটিয়ে সবাইকে মুক্তি, কল্যাণ ও প্রগতির পথে চলে নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

অন্যথায় কেউই ঐশী আযাব এবং কোপগ্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাবে না। স্রষ্টার রুদ্র রোষ থেকে বাঁচতে হলে বিশ্ববাসীকে যথাসময়ে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-কে সাদরে গ্রহণ-বরণ করে নিতে হবে।

- আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

চির বাসনা

ধরণী মাঝে আসিয়া প্রভু
তোমায় আমি ডাকিনি কভু,
আঁধার মাঝে ডুবিয়া থাকিয়া
করেছি পাপ তোমায় ভুলিয়া।

সারা জীবন কেটেছে ভ্রমে
পাপের পাহাড় বেড়েছে ক্রমে,
দোষী আমি অনেক দোষে
মন্দ আমি নয় সে মিছে।

কামনা-বাসনার রং মহলে
লোভ-লালসার রাজ প্রাসাদে,
মোহের মায়ায় ছিলাম অচেতন
প্রভু তোমায় ভুলিয়া।

তোমায় আমি না চিনিয়া,
সংসার সম্ভোগে ছিলাম নিমগ্ন,
শয়তানেরই ধোঁকায় পড়ে
মন হয়েছে পাপাসক্ত।

আমারই ভুলে তোমায় ভুলিয়া
মানুষরূপী ইবলীস বনিয়া,
দিয়াছি ধোঁকা মানব সমাজে
আজ এ দহন মোর অন্তর মাঝে।

জীবন কেটেছে মন্দ বাসনায়
আজ মন কাঁদে মোর সেই বেদনায়,
দু'চোখে মোর শ্রাবণ ধারা
তোমার একটু করুণার আশায়।

দূর করো মোর মনের কালিমা
দূর করো যত অহংকার।
বিকশিত করো অন্তর মম
খুলে দাও মনের রুদ্ধ দ্বার।

নিবিড় কালো আঁধার হ'তে
আমায় তুমি মুক্ত করো,
তোমার প্রেমের পুলক পরশে
আমায় হৃদয় ভরিয়ে তোল।

আমার মনে ছিল না আলো
ছিল নাকো দ্বীপ-শিখা,
কলি যুগের কৃষ্ণ এসে
দেখিয়েছে পথের দিশা।

সুশীল করো অন্তর মম
করো না স্বভাব ব্যঘ্রসম,
সৃষ্ট জীবের সেবায় সদা
থাকি যেন তৎপর।

সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রেখে
কেবল সংসার প্রেমে বিভোর থেকে।
তোমারই ইবাদত করিতে যেন
পারি জীবন ভর।

আমার মনের বাসনা যত
সবগুলোর যেন মৃত্যু হয়,
তোমারই সব ইচ্ছে যেন
আমার জীবনে পূর্ণ হয়।

আমায় জাগ্রত করো সুন্দর করো
করো নির্মল করো উজ্জ্বল,
আমার হৃদয়ে তোমার আলো
সদা যেন করে ঝলমল।

না চাহিতে তুমি দিয়েছ মোরে
বিশ্বজগতে তনু-মন-প্রাণ,
আমার বলিতে নেই কিছুই।
সব কিছু যে তোমারই দান।

তোমার প্রেমের করুণা ধারা
প্রবাহমান বিশ্বজুড়ে
তোমার প্রেমের ফুল ফুটেছে
মোর হৃদয়ের অন্তঃপুরে।

দূরে থাকিয়াও নিকটে তুমি
নিকটে থাকিয়াও দূরে,
তুমি আজ সব খানেতে
দেখেছি বিশ্ব ঘুরে।

পূর্বে তুমি যেমনি ছিলে
এখনো ঠিক তেমনি আছ,
আগের মতই সৃষ্টির সাথে
এখনো তুমি কথা বলো।

তোমার ঐশী নিদর্শনে
আকাশ মাটি উঠছে কেঁপে,
তোমার মসীহের আগমনে
চন্দ্র সূর্য যায় গ্রহণে।

আকাশ মোদের বলছে ডেকে
মসীহ্ এসেছে! মসীহ্ এসেছে!
বলছে মাটি কেঁপে কেঁপে
মসীহ্ এসেছে! মসীহ্ এসেছে!

মুক, বধির, অন্ধের দলে
বলছে কথা ভিন্ন সুরে
যেমন করে বলত কথা
পূর্ব যুগে কাফির দলে।

মিটবে না মোর মনের ক্ষুধা
না পেলে তোমার প্রেমের সুধা,
তোমার প্রেমে হ'তে বিলীন
শক্তি দাও মোরে।

ইমাম মাহ্দীর কিশ্তি চড়ে
যাব তোমার প্রেম সাগরে,
তোমার প্রেম-সুধায় তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে র'ব মরে।

তুমি আমার চির আপন
তুমি আজ আমার কাছে,
তোমার মাঝে মোর জীবনের
সব আনন্দ আছে।

নিশীথ রাতের নিবিড় আঁধারে
হৃদয় ভরা অশ্রুজলে,
তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।

প্রতিটি দিবস প্রতিটি রাত
প্রতিটি সন্ধ্যা, প্রতিটি প্রভাত,
তোমারই তাকওয়ায় কাটাব জীবন
আজ হ'তে মোর এ শুধু পণ।

আসুক যত বাধা-বিঘ্ন
আসুক যত ঝড়,
তোমার পথে চলব আমি
হয়ে অবিচল।

শিখাও মোরে তোমার বাণী
তোমার কালাম কুরআন খানি,
সকল কল্যাণ নিহিত আছে
এ কিতাবেরই মাঝে।

নবী সিদ্দীক শহীদ সালেহ্
ধন্য তাঁরা ত্রিভুবনে,
আমিও যেন মরতে পারি
তাঁদের সাথে মিলে।

- মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী

পর্দা প্রগতির দিশারী

(১১ম কিস্তি)

আল্লাহ্‌তাআলা ইসলামী সমাজ গড়ার প্রেক্ষাপটে যে সকল মূল নীতির দিক-দর্শন প্রদান করেন তন্মধ্যে পর্দা প্রথা অন্যতম। পর্দার বিধানের মাধ্যমে সমাজের নারী-পুরুষের অবাধ দর্শন ও মেলামেশাকে সংযত রেখে একটি সুশৃংখল পূতঃ-পবিত্র ও পরিকল্পিত সুশীল সমাজ গড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই ইসলাম নর-নারী উভয়ের জন্য পর্দা অবশ্য পালনীয় হিসাবে বিষদ পদ্ধতি প্রদান করে। যে সকল পন্থায় ব্যভিচারের বীজ মানব মনে উপ্ত হতে পারে ইসলামী পর্দার ব্যবস্থা সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজনীয় পর্দার পদ্ধতি দ্বারা ব্যভিচারের সম্ভাবনাকে নিশ্চিন্তভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছে। তাই পর্দা শুধু অঙ্গের নয় বরং দৃষ্টি কণ্ঠস্বর, সুর, গন্ধ এবং চিন্তারও পর্দা রয়েছে।

বাহ্যিকভাবে কোন নারীর হাত ও পায়ের পাতা ছাড়া দেহের বাকী সমস্ত অংশ পর্দা বা সতরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "যখন কোন স্ত্রীলোক গৃহের বের হয় তখন সে তার সমস্ত দেহকে আবৃত করে বের হবে" (নূর ঃ ৩২)।

হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "কোন নারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পর্দাবৃত থাকা উচিত" (তিরমিযী)। অর্থাৎ স্বাভাবিক চাহনির জন্য মুখমন্ডলের প্রয়োজনীয় অংশ এবং চলাচল ও কাজের জন্য হাত ও পায়ের পাতা খোলা রাখা শরীয়তসম্মত।

পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশকে পর্দা বা সতরের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "যা নাভী ও হাঁটুর মাঝখানে আছে, তা দেখাবে না" (আবূ দাউদ)। হযরত আলী হতে বর্ণিত আছে, "হুযূর (সঃ) বলেন, 'হে আলী! তোমার উরুদেশকে খোলা রাখবে না এবং কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির উরুদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে" (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা)।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে কোন প্রসূতির সন্তান প্রসবের সময় এবং কোন রোগীর চিকিৎসাধীন সময় ধাত্রী বা চিকিৎসক কর্তৃক প্রয়োজনে দেখা যাবে কি না? উত্তরে বলা যায়, ইসলামে অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান প্রযোজ্য। তাই শুধু মাত্র প্রসব বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গুপ্তাংশ দেখা শরীয়তে অনুমোদিত।

দৃষ্টির পর্দা রক্ষার্থে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পরম বন্ধু হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, "হে নবী মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজের দৃষ্টি নীচের দিকে রেখে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি (সূরা নূর ঃ ৩১)। মু'মিন স্ত্রীলোকদেরকে বলুন তারা যেন নিজেদের চোখকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে (সূরা নূর ঃ ৩২)। দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মানুষের কু-ধারণার উন্মেষ হয় বিধায় নর-নারী উভয়কে কাম সংযত রেখে লজ্জাস্থানে হেফাযতের নির্দেশ দিয়েছেন। চলার পথে কারও প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা ইসলামের শিক্ষা। কেননা, হঠাৎ দৃষ্টি পড়া মাত্রই প্রবৃত্তির তরঙ্গ সৃষ্টি হয় না। তাই আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "হে মানব সন্তান! তোমার প্রথম দৃষ্টিতো ক্ষমারযোগ্য। কিন্তু সাবধান! দ্বিতীয় বার যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ না কর" (জাজ্জায)। একদা হুযূর (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেন, "হে আলী! তুমি (প্রথম) দৃষ্টির পর (দ্বিতীয়বার) দৃষ্টিপাত করো না। কারণ প্রথম (হঠাৎ দৃষ্টি) তোমার, দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার জন্য নহে" (তিরমিযী)।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) আ হযরত (সঃ)-এর নিকট ছিলেন। এমন সময়ে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) তাঁর নিকট আসেন। তিনি (সঃ) বলেন, তার সাথে পর্দা কর। আমি (উম্মে সালমা) বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদিগকে দেখেন না। হুযূর (সঃ) বলেন, তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখ না? (আবূ দাউদ)। অর্থাৎ কেউ অন্ধ হলে তার সাথেও পর্দা পালন করতে হয়। কেননা, অন্ধ ব্যক্তির মাঝে প্রবৃত্তির মন্দ প্রভাব সৃষ্টি না হলেও অন্ধহীন দর্শক ব্যক্তির মাঝে তা হতে পারে।

দৃষ্টির দূরারোগ্য ব্যধিতে যারা আক্রান্ত তাদের উদ্দেশ্য আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তাআলার অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর, যে কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় এবং যে উহার লক্ষ্য হয়" (বায়হাকী)। যে ব্যক্তি কোন পর নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে" (ফাতহুল কাদীর) আর যারা এ ব্যধির সংক্রামণ হতে মুক্ত থাকে তাদের উদ্দেশ্যে হুযূর (সঃ) বলেন, "হঠাৎ কোন রমনীর রূপ সৌন্দর্যের প্রতি কোন মুসলমানের দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে যদি কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে দৃষ্টি অবনত করে তবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে এমনভাবে ইবাদত করার তৌফীক দেবেন যাতে সে পরম তৃপ্তি লাভ করতে পারে" (আহমদ)।

উত্তম জীবন বিধানের ধর্ম ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপর গৃহে স্ত্রী ব্যতীত স্বামী বা অন্য কেউ যখন না থাকে তখন যাওয়া উচিত নয়। আমর বিন আস বলেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে যেতে নবী করীম (সঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী)। হুযূর (সঃ) বলেন, "আজ থেকে যেন কেউ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকট না যায়, যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দু'জন লোক না থাকে" (মুসলিম)। কারও গৃহে গেলে সালাম দিয়ে প্রবেশের অনুমতি নিতে হয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীগণকে সালাম কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম হবে যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" (সূরা নূর ঃ ২৮)। অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করলে প্রয়োজনে কোন নারীর নিকট পর্দার আড়াল হতে কোন কিছু চাও তখন পর্দার অন্তরাল হতে তাদের নিকট চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের এবং তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতার কারণ" (সূরা আহযাব ঃ ৫৪)।

কারও ঘরে উঁকি দেয়া ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। একবার এক ব্যক্তি হুযূর (সঃ)-এর গৃহে উঁকি দিলে, হুযূর (সঃ) তাকে বলেন, "আমি যদি জানতাম তুমি উঁকি মারবে তাহলে তোমাদের চোখে কিছু ঢুকিয়ে দিতাম। অনুমতি নেয়ার আদেশ দৃষ্টিকে সংযত রাখার জন্যই দেয়া হয়েছে" (বুখারী)।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নও, তোমরা যদি তাওকয়া অবলম্বন করে চল, অতএব তোমরা নম্র-মিহি সূরে কথা বলবে না। কেননা, যার অন্তরে ব্যাধি আছে যে, প্রলুব্ধ হতে পারে। সদা সংযত স্বরে কথা বলবে (আহযাব ঃ ৩৩)। অর্থাৎ আগন্তুক পুরুষের

সাথে পর্দার আড়াল হতে সকল নারীর এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন মনের মন্দভাব বিনিময়ের অবস্থা সৃষ্টি না হয়। কেননা, তাতে অবৈধ প্রেম সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

তাই কোমল স্বরে কথা বলা ইসলামে নিষেধ। প্রশ্ন আসে, তাহলে নারী কণ্ঠের গান জায়েয কিনা। যে সকল কথা ও সুরে মন্দ আবেগ সৃষ্টি হয় না এবং মনকে পুলকিত করে না, বাদ্য যন্ত্রবিহীন সেই সকল গান, গজল, নাত, হামদ ও নযম পর্দা রক্ষা করে নারীগণ গাইতে পারে। ইসলামের প্রথম যুগে আরবের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গীত, গজল ও নযম ইত্যাদি গাওয়ার প্রচলন ছিল। হযরত আমর বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, "আমি একদা কুয্যা ইবনে কা'ব ও আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ)-এর নিকট এক বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে দেখি কয়েকজন মেয়ে গজল গাচ্ছে। আমি তাদেরকে বললাম, হে রসূলের সাহাবীগণ! হে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণ! আমাদের সম্মুখে এরা গান বাদ্য করছে?' এর উত্তরে আমাকে বললেন, ইচ্ছা হলে বস আমাদের সাথে শুনতে পার নতুবা চলে যাও। কেননা, বিবাহ অনুষ্ঠানে গজল গাওয়ার অনুমতি আছে" (নাসায়ী)।

তবে আধুনিক গান-বাজনা ও নাচ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাতে অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। মানব মনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। সমাজে অবক্ষয়ের বিষক্রিয়া সংক্রমিত হয়। পাশ্চাত্য আধুনিক সঙ্গীত জগতের ভয়াবহতা যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তাদের মনিষী প্রফেসর ব্লুম (Prof bloom) তার দি ক্লোজিং অব দি এ্যামেরিকান মাইন্ডস (The Closing of the American minds) পুস্তকে সমসাময়িক যুগের কিশোর ও তরুণদের মনের সংবেদনশীল অনুভূতিসমূহের অবক্ষয়ের জন্য বিলাপ করেছেন। বলেছেন, এ কিশোর ও তরুণরা অনবরত রক সঙ্গীতের (Rock Music) প্রভাবাধীন থাকার দরুন পশুতে পরিণত হচ্ছে। এ জাতীয় সঙ্গীতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, এগুলো আত্মার জন্য নেশাযুক্ত নোংরা খাদ্য (বিশ্ব শান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান পৃষ্ঠা ঃ ৭৬)। (চলবে)

- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

৫ম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে নও (রাজশাহী রিজিওনাল-১) তা'লীম-তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৩

আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় ৫দিন ব্যাপী ৫ম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফেনও (রাজশাহী রিজিওন-১) তা'লীম-তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৩ইং গত ৩০/৪/০৩ থেকে ০৪/০৫/০৩ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জামাত থেকে ৩৬ জন ওয়াকফেনও শিশু, ৩৬ জন মাতা এবং ১২ পিতা ক্লাসে যোগদান করেন। ৩০/০৪/০৩ তারিখে বিকাল ৩টায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলওয়াত করে ওয়াকফে নও এনামুর রহমান এবং নযম পাঠ করে ওয়াকফে নও মোজাহিদ তারেক আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী অধ্যাপক রাজীব উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ আব্দুস সালাম। বিকাল ৪.৩০ থেকে অনুষ্ঠান সূচী মোতাবেক যথারীতি তা'লীম-তরবিয়তি ক্লাস শুরু হয়। এরপর প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত চলে। ৯টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ক্লাসের বিষয়গুলো এবং প্রশিক্ষকগণ (১) পবিত্র কুরআন (শেষের ৫টি সূরা অনুবাদ শব্দার্থ সহ শিক্ষা- মোয়াল্লেম আব্দুস সালাম (২) হাদীস শিক্ষা- মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রধান (৩) দোয়া শিক্ষা- মোয়াল্লেম (অবসরপ্রাপ্ত) ইসরাঈল দেওয়ান (৪) আদব-আখলাক শিক্ষা-

মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রধান (৫) কুরআন তাজবীদ শিক্ষা-অধ্যাপক রাজীব উদ্দিন আহমদ (৬) উর্দূ শিক্ষা- মোয়াল্লেম আব্দুস সালাম (৭) নযম শিক্ষা- মাহমুদ আহমদ শরীফ ও মৌলভী শের আলী (৮) বক্তৃতা শিক্ষা- মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ শরীফ (৯) দীনিমা'লুমাত ও আকাঈদ শিক্ষা-অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ। ০৪/০৪/০৩ তারিখে ৪ দিনের ক্লাসের উপর ভিত্তি করে ওয়াকফে নও (সিনিয়র, জুনিয়র ও কনিষ্ঠ গ্রুপ) পিতা ও মাতাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় ওয়াকফেনও সেক্রেটারী। বিচারকমন্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন ক্লাসের শিক্ষকগণ। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অন্যদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেয়া হয়। ০৪/০৩/০৩ তারিখে যোহর ও আসর নামায জমা করে বেলা ২.৩০টায় সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। কেন্দ্র থেকে আগত ন্যাশনাল সেক্রেটারী (ওয়াকফে নও) মোহতরম সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে ওয়াকফেনও মোজাহিদ এনামুর রহমান সাদাফ, নযম পাঠ করে রশীদ আহমদ। পিতাদের মধ্যে দু'জন বক্তব্য রাখেন তারা হচ্ছেন জনাব তমিজ উদ্দীন আফ্রাদ (আহমদনগর) এবং জনাব শাহীনুল ইসলাম মার্শাল (তারাগঞ্জ)। মাতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিসেস নাসিমা বশিরুর রহমান (আহমদনগর)। ওয়াকফে নও বাচ্চাদের তা'লীম-তরবিয়ত প্রদান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মোয়াল্লেম মোহাম্মদ আব্দুস সালাম। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ। এরপর হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব। তিনি পিতা-মাতা, জামাতের মোয়াল্লেম এবং ওয়াকফে নও সন্তানদের উদ্দেশ্যে তার নসীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন বিভাগীয় ওয়াকফেনও সেক্রেটারী অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ। পুরস্কার ও দোয়া পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী। ৫ দিন ব্যাপী তালীম-তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন অত্যন্ত সুন্দর ও সার্থকভাবে শেষ হয়।

- অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ
রাজশাহী বিভাগীয় ওয়াকফেনও সেক্রেটারী

কবিতা

কবিতা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর অন্তর্ধানে অশ্রু অঞ্জলি

পৃথিবীর আঙ্গিনায় যে সর্বোচ্চ বৃক্ষটি;
তারা মগডালে মধুর সুরে গাইত একটি পাখি।
প্রভাতে, দুপুরের পর-সাঁঝের বেলা;
সে সুর ইথারের যানে কেঁপে কেঁপে ছড়াত দিক্ দিগন্ত।
হঠাৎ করে সে পাখিটি উড়ে গেল কোন্ সুদূরে;
বয়েষি বট বৃক্ষের আগডালে দোল দিয়ে।
কেন যেন কেঁপে উঠল ধরণীর কুসুম কানন,
এ এক অব্যক্ত বেদনার জ্বালা।
হৃদয় বিদারী গজলের সুরে সুরে।
কল্পিত হলো সাগর সৈকত মরু-মরিচীকা।
পাষাণের গায়ে আঁছড়ে পরে ঢেউয়ের ঝুঁটি;
কিন্তু কী হবে তাতে এতো শ্বাশ্বত সত্যের প্রাচীর।
মানসপটে ভেসে উঠে সুদূরে; যেখানে আকাশ নেমেছে সাগরের বুকে;
ক্লান্ত দু'টি পাখা ছড়িয়ে মিশে গেছে দিগন্তের নিলিমায়;
ছায়া তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেছে সাগরের জলে দৃষ্টির শেষ সীমানায়;
প্রেমিকের বক্ষে রেখে গেছে দীর্ঘশ্বাসের মুর্ছনা।
এ পাখিটি গাইত চেনা অচেনা সূরে গান;
এ গানের বাণীতে যেন অনাদির সুর।
সহসা থেমে গেছে সে গানের লহরী;
সাগর সৈকত ঢেকে গেল হিমশীতল নীরবতায়।
সে গানে ছিল আরব ইরানের প্রাচীনতা,
স্বর্গীয় প্রতিধ্বনির গাম্ভীর্যের মাধুরী।
প্রাঞ্জলতা ছুঁয়ে যেত হৃদয়ের পাঁপড়িগুলোতে;
তা ছিল এক নিবিড় সুখের অনুভূতি।
ছিল না তাতে বাগ্মিতার বাগাড়ম্বরতা
কৃত্রিমতা বর্জিত প্রকৃতির তটে নিয়ন্ত্রিত।
গানের কথাগুলো ছিল জীবনের কথা,
তার নেপথ্যে ছিল অনন্ত কালের ব্যঞ্জনা।
তাই বলে কি সে চিরচেনা মুখ বিস্মৃত হলো!
না, না, তাতো চিরন্তন ছায়া ফেলে গেছে হৃদয়ের স্তরে স্তরে।
বাণী তার নিবন্ধিত হয়েছে মাথার খুলির নীচে;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে এঁকে গেছে মায়াবী আল্পনা।
যুগ যুগ ধরি তা ধ্বনিত হবে মানবতার আকাশে,
যতকাল আকাশটা এ আলোতে পরিব্যাপ্ত না হয়।

- আবুল হাসান

সংবাদ

পাক্ষিক আহমদীতে সংবাদ প্রেরকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের স্থানীয় পর্যায়ে দিবস পালন, তা'লীম তরবিয়তী অনুষ্ঠানাদি ও অন্যান্য খবরা-খবর যা পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশের জন্য যারা পাঠিয়ে থাকেন তাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, তারা যেন যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি, ক্লাস বা দিবস উদযাপনের সংবাদগুলো খুব সংক্ষেপে স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠান। কারণ পাক্ষিক আহমদী কোন সংবাদপত্র নয়। এটি একটি সাময়িকী বিশেষ। এতে বড় বড় সংবাদ বা বিস্তারিত তথ্যসহ প্রেরিত দীর্ঘ সংবাদকে সংক্ষেপ করে পুনরায় সংবাদ তৈরী করে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তবু আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাক্ষিক আহমদীর প্রচার ও প্রসারের জন্য সুহৃদ পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

মোঃ আবদুল জলিল, বার্তা সম্পাদক

সারা দেশে সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস পালন

১৫ই মে ছিল ঈদে মিলাদুন্নবী। এদিন ছিল সরকারী ছুটি। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দেশব্যাপী স্থানীয় জামাতসমূহে এবং অঙ্গ সংগঠনগুলোতে সীরাতুন্ নবী (সঃ) জলসার আয়োজন করা হয় এ দিনটিতে। খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও অনুকরণীয় জীবনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে বক্তারা বক্তব্য পেশ করেন। নবী করীম (সঃ)-এর জীবনাদর্শে যে আমাদের জীবনের আবেহায়াত রয়েছে সকলে তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন এ দিনটিতে।

এ পর্যন্ত যেসব জামাত বা সংগঠন থেকে দিনটি পালনের সংবাদ এসেছে। তারা হলেন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বানিয়াজান, উথলী, বলারদিয়ার সরিষাবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, শালগাঁও, তেরগাতি, নিউ সোনাতলা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা, এখনও সংবাদ আসছে।

- আহমদী বার্তা

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আল্হাজ্জ ডাঃ মোঃ আখতার হোসেন মিয়াজী বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ থেকে ২০০২ সালের ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এ্যান্ড সার্জারী (ডি এইচ এম এস) ফাইনাল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন (রোল ৯৯) আল্হামদুলিল্লাহ্। তিনি মেধাবী ছাত্র। জনাব আখতার হোসেন ১৯৯৭ সনে যুক্তরাজ্যের এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায়' পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। পি এইচ ডি কোর্সে পড়াকালীন সময়ে তিনি ইংল্যান্ডের এক্সিটার কলেজে হোমিওপ্যাথির উপর দশ সপ্তাহের একটি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। সেখান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ১৯৯৮ সালে তিনি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডি এইচ এম এস কোর্সে ভর্তি হন। তাছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যানে ১৯৭৫ সনে অনার্স এবং ১৯৭৬ সনে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যের এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয় হতে জনসংখ্যা গবেষণায়ও তিনি মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৮৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'কারিকুলাম প্রণয়ন'-এর উপর মাষ্টার টেনার সনদ প্রাপ্ত হন। ১৯৯৩ সনে তিনি থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনে শিক্ষা সফর করেন। ১৯৬৪ সনে তিনি প্রাইমারী এবং ১৯৬৭ সনে আবাসিক জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন।

জনাব আখতার হোসেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন নিপোর্টের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তারুয়া গ্রামের জনাব মোঃ মাজু মিয়া মিয়াজীর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর মতে, মনোযোগ সহকারে চিকিৎসা করলে হোমিওপ্যাথিতে যে কোন রোগের আরোগ্য লাভ সম্ভব।

- আহমদী বার্তা

(দ্বিতীয় প্রচ্ছদের অবশিষ্টাংশ)

যুগ-ইমামের সাথে গভীর সম্পর্কের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত। আর তিনিই সব ধরনের ফিৎনা ও পরীক্ষায় আপনার জন্য ঢাল হয়ে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ "কেবল সে শাখাই ফল ধারণ করতে সক্ষম যা মূল গাছের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর যে ডাল কর্তিত অবস্থায় মূল গাছের সাথে সম্পর্কহীন তা কখনও ফল দেয় না। একইভাবে কেবল সে ব্যক্তিই জামাতের উত্তম সেবা করতে পারে, যে নিজেকে যুগ-ইমামের সাথে সম্পৃক্ত রাখে। কোন ব্যক্তি যদি 'যুগ ইমামের' সাথে নিজের সম্পর্ক সুদৃঢ় না রাখে তা'হলে বিশ্বের সবজান্তা হয়েও সে এক ছাগলের বাচ্চার সমানও কাজ সম্পাদন করতে পারবে না।"

অতএব আপনারা উন্নতি করতে চাইলে আর পৃথিবীতে বিজয়ী হতে চাইলে আপনাদের প্রতি আমার উপদেশ ও আমার বাণী হলো, আপনারা খিলাফতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আল্লাহ্‌র এ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। আমাদের সকল উন্নতির ভিত্তি খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের মাঝে নিহিত।

আল্লাহ্ আপনাদের সবার রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। আর আমাদের সবাইকে খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও সম্পৃক্ততা স্থাপনের সৌভাগ্য দিন।

ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার
স্বাক্ষরিত
মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস
তারিখ ঃ ১১ই মে ২০০৩,
[আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩-৫-২০০৩ এর সৌজন্যে]

অনুবাদ- **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**

সংশোধনী

অনবধানবশতঃ পাক্ষিক আহমদীর বিগত সংখ্যায় মুদ্রণ জনিত কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। এ জন্যে আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

পৃষ্ঠা নং	কলাম নং	লাইন নং	ছিল	হবে
২১	২	৩৭	কারণ	কিরণ
৩৪	১	৩	১৩ই মার্চ	২৩ই মার্চ

সংবাদ

আঞ্চলিক তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৪ হতে ২৭ইং তারিখ ৪দিন ব্যাপী জামালপুর জোনের উদ্যোগে তালীম-তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হোসনাবাদ মসজিদে। গত ২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদ আসর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আঞ্চলিক তা'লীম তরবিয়তি ক্লাসের চেয়ারম্যান জনাব আবদুর রহিম ভুইয়া, প্রেসিডেন্ট হোসনাবাদ সাহেবের সভাপতিত্বে ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস শুরু কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত মৌঃ বেলাল উদ্দিন, মোয়াল্লেম নযম পাঠ করেন। নছিহতমূলক বক্তব্য রাখেন ক্লাস ইনচার্জ জনাব মৌঃ আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান অর্থ সচিব কামালপুর জোন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান জনাব আঃ রহিম ভুইয়া প্রেসিডেন্ট, হোসনাবাদ এবং উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জনাব আবু খালিদ উপ-আহবায়ক, জামালপুর জোন। এরপরে যথারীতি ক্লাস এর কার্যক্রম চলে। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪০ জন খোদ্দাম, আনসার ও আতফাল উপস্থিত ছিল।

নেযাম ও মালি কুরবানীসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। জনাব আঃ জলিল সাহেব সেক্রেটারী তা'লীম-তরবিয়ত। জনাব জুলফিকার আলী এডিঃ মাল। জনাব আসাদ উল্লাহ্ আসাদ, ক্লাস ইনচার্জ। জনাব ছলিমুল্লাহ্ প্রেসিডেন্ট জামালপুর (প্রাঃ উপ আহবায়ক, জামালপুর জোন)।

নির্ধারিত বিষয়ের উপর ক্লাস নেন মৌঃ আসাদুল্লাহ্ আসাদ। মৌঃ বেলাল উদ্দিন, মৌঃ ইদ্রিস আহমদ, মৌঃ ফরহাদ মোয়াল্লেম ক্লাস শেষে ছাত্রদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয় এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস এর চেয়ারম্যান জনাব আবদুর রহীম ভুইয়া সমাপনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যের মাধ্যমে এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

- মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম,
সেক্রেটারী, তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস,
জামালপুর জোন

ওয়াকফে নও সম্মেলন' ০৩ (খুলনা বিভাগ)

আল্লাহ্‌র রহমতে খুলনা বিভাগীয় ৫ম বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলন ২০০৩ইং সাফল্যজনকভাবে গত ২৬-৩০ এপ্রিল ২০০৩ইং অনুষ্ঠিত হলো আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন এর মসজিদ বায়তুস্ সালামে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

সভাপতি ছিলেন মোহতরম বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব জি এম মতিয়ার রহমান। প্রধান অতিধি ছিলেন

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহতারম শেখ সফর উদ্দিন, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান (মুকুল) সহ সেক্রেটারী ওয়াকফে নও (খুলনা বিভাগ)। তা'লীম- তরবিয়তি ক্লাসে শিক্ষক ছিলেন মোয়াল্লেম শেখ আঃ ওয়াদুদ ও মোয়াল্লেম এনামুল হক রনি। দেহাতী মোয়াল্লেমগণও ক্লাসের সহযোগিতা করেন।

২৫শে এপ্রিল' ০৩ দিবাগত রাত্র ৪.০০ ঘটিকায় তাহাজ্জুদ নামায দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং ৩০শে এপ্রিল আসর নামায শেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সম্মেলনে ওয়াকেফীনে নও শিশু ২৪ জন, পিতা- ১৪ জন, মাতা- ১৬ জন এবং মাতাদের সাথে আরও ৯ জন শিশু মিলে মোট ৬৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

- শেখ মাহফুজুর রহমান
সহঃ সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
খুলনা বিভাগ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

CONCORD

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆22th Issue May 31, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

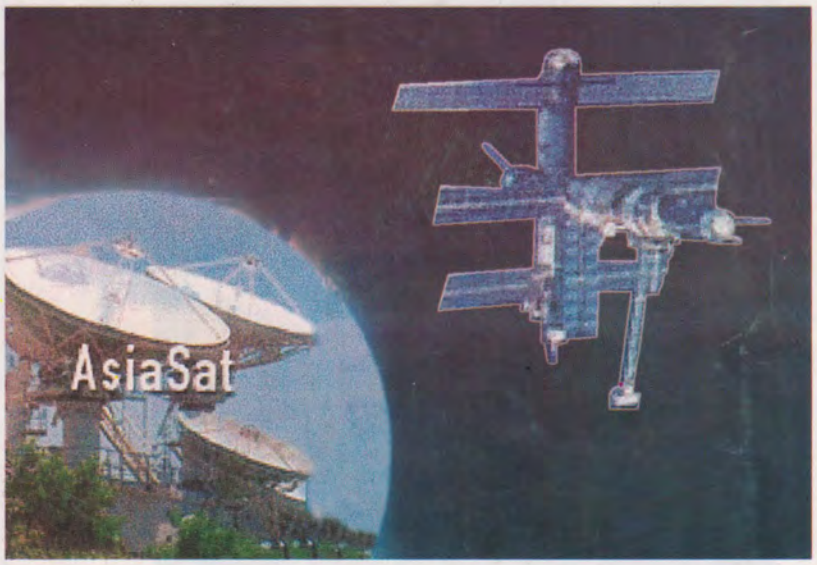

لا إله إلا الله محمد رسول الله

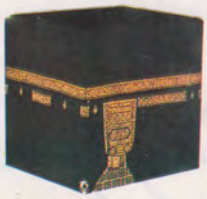

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার
-

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com